৩ অক্টোবর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

সোনামেলা

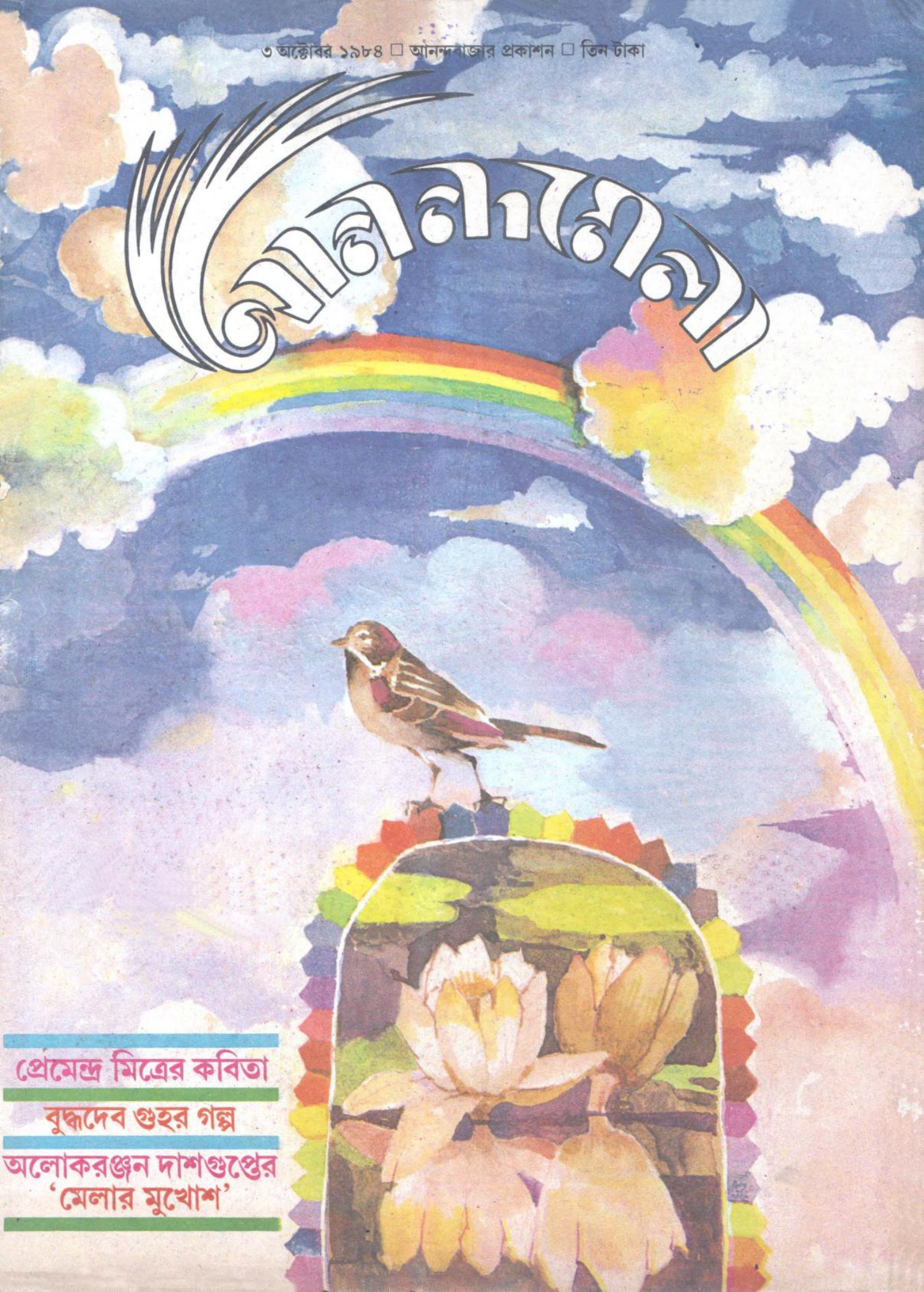

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

বুদ্ধদেব গুহর গল্প

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
'মেলার মুখোশ'

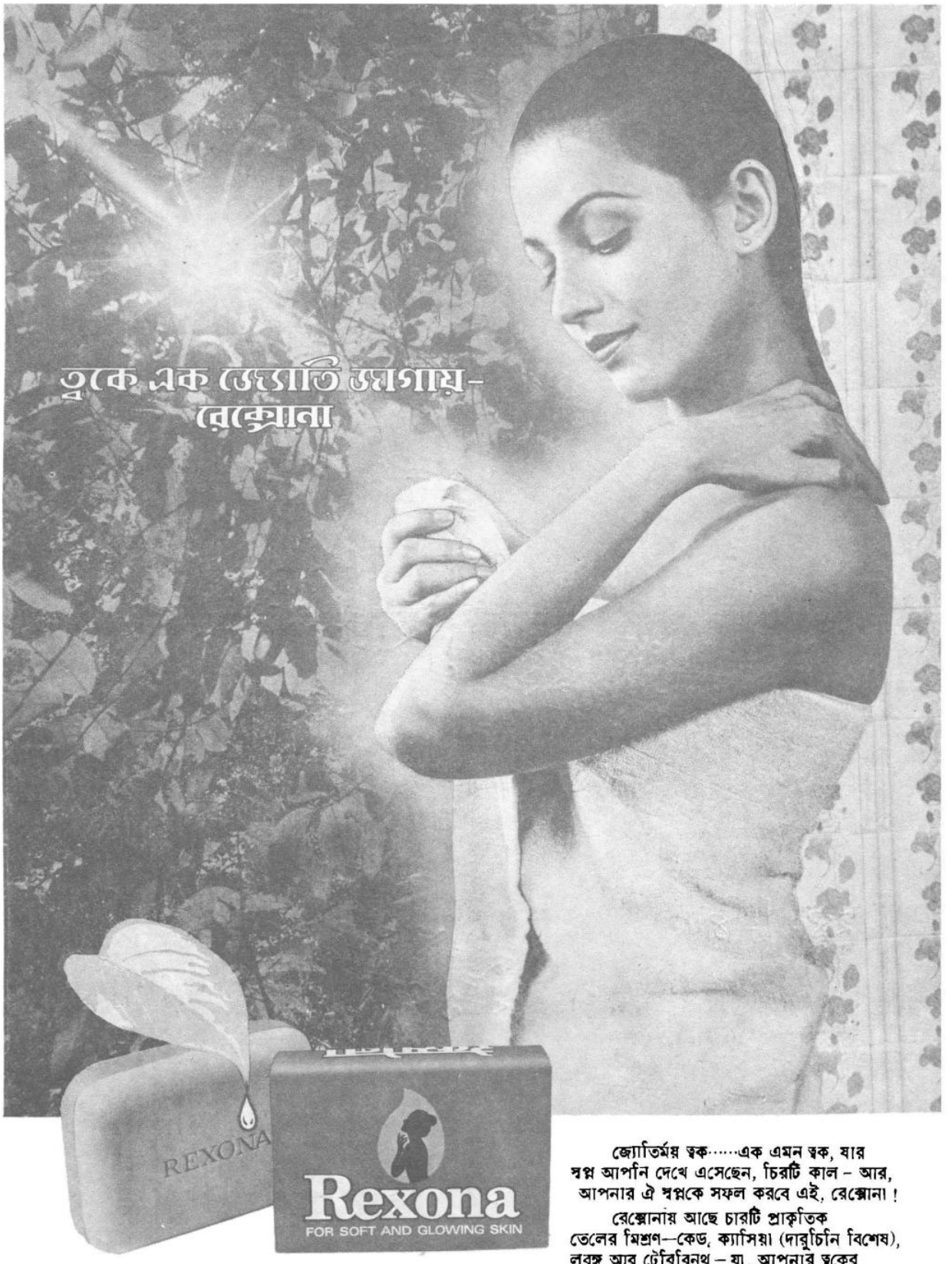

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

আনন্দমেলা

১৭ আশ্বিন ১৩৯১ □ ৩ অক্টোবর ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ৭ সংখ্যা

কবিতা ও ছড়া
চেনা-অচেনা । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৮
শিশুর প্রশ্ন । প্রভাতকুমার দত্ত ১৯
ছড়াছড়ি । শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৯
চাঁদ নেমেছে । সলিল বেজ ৫৯
গল্প
এবার পুজোয় । বুদ্ধদেব গুহ ৯
নেপোলিয়নের নবজীবন । রেবন্ত গোস্বামী ১৩
বনের রাজা । সুবোধ ভট্টাচার্য ১৭
ইলামবাজারের বনে । অজেয় রায় ২৫
ব্রাউনিঙের বঙ্গভূমি । বাণীব্রত চক্রবর্তী ২৭
বিশ্ববিচিত্রা
মেলার মুখোশ । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩০
উপন্যাস
মানুষবলির জঙ্গলে (শেষাংশ) । শৈলেন ঘোষ ৩২
শার্লক হোমসের গল্পমালা
লালচুল সমিতি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫২
ইতিহাসের গল্প
হার্সিসাহেবের কাণ্ড । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪৪
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫১
লেখাপড়া
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৭
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৭
মহিষাদল রাজ-হাইস্কুল । শ্যামলকান্তি দাশ ৫৮
খেলাধুলো
শিশু-শ্রীলঙ্কা দামাল হয়ে উঠছে । অশোক রায় ৬৩
গাওয়ারের সামনে আর-এক পরীক্ষা । মণীশ মৌলিক ৬৫
অপ্রতিরোধ্য নাভ্রাতিলোভা ও ম্যাকেনরো । সুব্রত সিংহ ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, সদাশিব ৪৮
গাবলু ৬২, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৫৭
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ৪৬
মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ৪৭
তোমাদের পাতা ৪৯
প্রচ্ছদ : জগদীশ রায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক । ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

বিনামূল্যে উপহার!

গ্লুকন-ডি ®'র

নিমেষে শক্তি যোগানোর সাথে

এক চমৎকার স্টেনলেস স্টীলের চামচ

আপনার রোজকার নিমেষে শক্তি যোগানোর পানীয়কে নেড়ে গোলবার এক চমৎকার জিনিস ··· এই ঝকমকে স্টেনলেস স্টীলের চামচ ··· যা ৪০০ গ্রামের গ্লুকন-ডি প্যাকের সঙ্গেই পাবেন··· একদম বিনামূল্যে !

তরতাজা করা, ঠাণ্ডা আমেজ ভরা, শক্তি যোগানদার গ্লুকন-ডি···যা ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে ভরপুর !

ফলের রস, দুধ, চা, কফি, জল···যা খুশির সঙ্গে গুলে নিন বা শুধুই খান – তবে, সবকিছু গুলতেই ব্যবহার করুন গ্লুকন-ডি'র বিশেষ উপহারের চমৎকার চামচটি !

GLL-9686

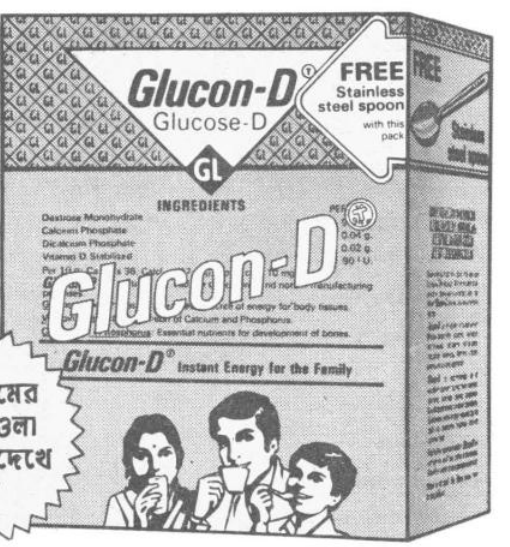

৪০০ গ্রামের উপহারওলা প্যাকটি দেখে নিন

শুধুমাত্র নির্ধারিত বাজারগুলিতে সীমিত স্টক রয়েছে

গ্লুকন-ডি ® –নিমেষে শক্তি যোগানদার

স্বাস্থ্যের উৎস গ্ল্যাক্সো

সুচ কেন সহজে ফুটো করে

একটা সুচ দিয়ে যত সহজে ফুটো করা যায়, একটা ভোঁতা পেরেক দিয়ে কি তত সহজে ফুটো করা সম্ভব ? ভোঁতা পেরেক তো দূরের কথা, একটা আলপিনের মুখ ভোঁতা হলে তা দিয়ে সামান্য কটা কাগজ গেঁথে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে।

কেন এ রকম হয় ?

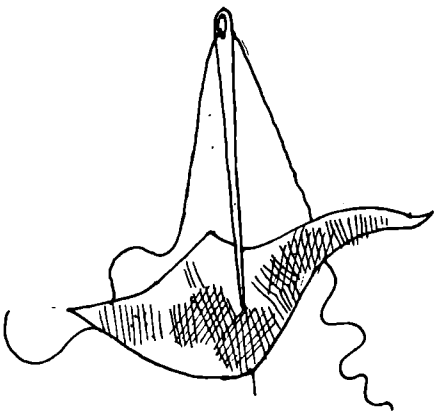

আলপিন বা পেরেকের ভোঁতা মুখ দিয়ে যেখানে ছিদ্র করা কঠিন, সেখানে সুচ কেন সহজে ফুটো করে ?

সরু সুচ এবং ভোঁতা পেরেক বা আলপিন—দুটো ক্ষেত্রেই সমান শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু বল সমান হলে কী হবে, চাপ(pressure)যেটা পড়ছে, সেটা সমান নয়। অথচ এই চাপের উপরে ছিদ্র করা সহজ কি কঠিন, তা নির্ভর করে।

যখন আমরা চাপের কথা বলি, তখন শক্তি ছাড়াও যে ক্ষেত্র জুড়ে সেই শক্তি ক্রিয়া করছে, তাকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হয়।

যদি বলা হয়, দুজন কাজের লোককে একশো টাকা করেই দেওয়া হল, কিন্তু একজনকে এক মাসে, আর একজনকে দু-মাসে তাহলে তাদের মাইনে যেমন সমান হয় না, তেমনি শক্তি প্রয়োগ সমান হলেও ক্ষেত্র বড়-ছোট হলে চাপ আলাদা হবে। শক্তির সঙ্গে চাপের এমন একটা সম্পর্ক যে, ক্ষেত্র যত ছোট হবে চাপ তত বাড়বে। আসলে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে অল্প জায়গায় চাপকে বাড়িয়ে তোলে। আর একই শক্তিতে ক্ষেত্র বড় হলে চাপ কমে।

সেইজন্যে সরু সুচে চাপ বেশি পড়ে বলে ছিদ্র হবে সহজে।

ধারালো ছুরিতে যে ভাল কাটে তা এই একই কারণে। যত ধারালো হবে, ছুরির উপরে দেওয়া শক্তি কাজ করার জন্যে তত কম জায়গা পাবে। ফলে শক্তি ছুরির ফলার ছোট ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকবে। চাপ বাড়বে। সুচ যেমন সহজে ছিদ্র করে, ধারালো ছুরি তেমনি ভাল কাটে।

বেলুন ফাটলে শব্দ হয় কেন

একটা বেলুনকে ফোলাতে ফোলাতে অনেক সময়ে সে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন আর-একটা ফুঁতেই সে ফেটে যায়। কিন্তু বেলুন ফেটে গেলে শব্দ হয় কেন ? এমন তো হতে পারত, ফোলাতে ফোলাতে বেলুন শেষ পর্যন্ত ফেটে গেল, কিন্তু কোনো শব্দ কানে এসে পৌঁছল না।

ফেটে গেলেই যে শব্দ হয়, এর কারণ কী ?

শব্দ মানেই বাতাসে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি। পুকুরে ইট ছুঁড়লে জলে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমনি বেলুন যখন ফাটে তখনও ধাক্কা লাগে, ঢেউ ওঠে। এমনিতে ফোলানো বেলুন ভেতরের বাতাসকে বাইরের বাতাস থেকে আলাদা করে রেখেছে। ফোলা বেলুনের ভেতরে চাপ বাইরের থেকে বেশি। চাপ বেশি হওয়ার জন্যে বেলুন যখন ফাটে তখন হঠাৎ বাইরের বাতাসের উপর বেলুনের ভেতরকার বাতাসের অতিরিক্ত চাপ এসে পড়ে। তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই যে তরঙ্গ হল, তা বাতাসের ভেতর দিয়ে কানের পর্দায় এসে ধাক্কা দিয়ে শব্দের অনুভূতি জাগায়।

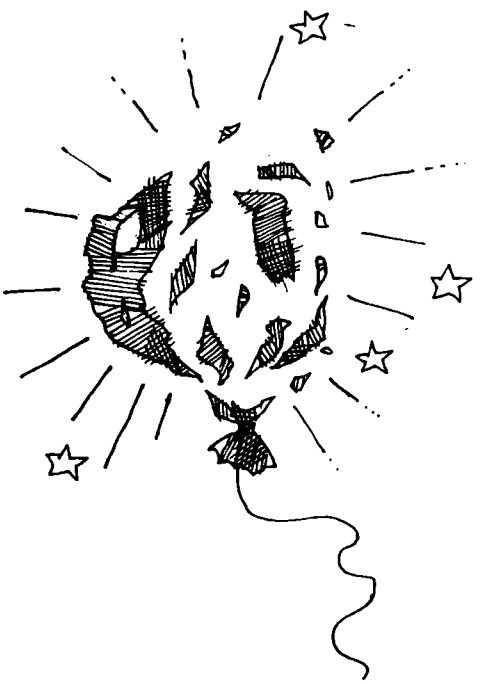

বোম যখন ফাটে তখন চারপাশের বাতাসের উপরে অতিরিক্ত একটা চাপ এসে পড়ে। ফলে আগের মতোই কানে একটা শব্দের অনুভূতি জাগে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই।

সুপার রিন-এর দিকে আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন।
চমৎকার নতুন মোড়ক—আর, আহ্, অপূর্ব এক নতুন সুগন্ধ!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার দিকে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন।
সুপার রিন শুভ্রতার শক্তির ভরপুর এক ভাণ্ডার। এ আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা, যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই। আপনি নিজেই দেখুন না— সুপার রিনে কাচা জামাকাপড় এমন ধবধবে সাদা হয় যে সবার মাঝে লোকের নজর কেড়ে নেয়।

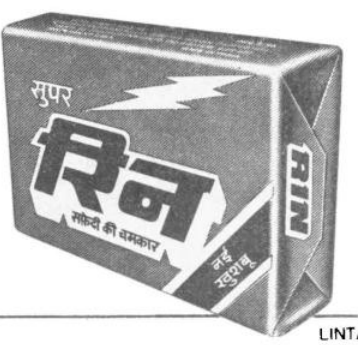

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS RIN 69 2416 BG

বাংলা বলো

জায়গাবদল

"বন্ধুগণ, ত্রি-ফলার আচরণ লক্ষ করলেন।" স্যাণ্ডউইচের খান-তিনেক পেটে চালান করে দিয়ে হিগিনকাকুর গলায় বেশ তেজ এসেছে বলে মনে হল। "এনারা তিনজনাতেই শব্দের গোড়ায় চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকেন কিন্তু মাঝখানে ধাক্কাধাক্কি করেন—ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে দ্যান। 'ক্ষ' 'জ্ঞ'-এর ব্যবহারও প্রায় একই রকম, গোড়াতে শান্তশিষ্ট, মাঝখানে ধুমধাড়াক্কা।"

ভণ্টুর বাবা বললেন, "কিন্তু হিগিনবথাম, ভাই, আমি তোমাকে 'হ্ন' আর 'হ্ণ' এবং 'ক্ষ'-এর বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। এরা কী করে?"

"ওঃ, বড়দা, এদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা নেই। এরা তো শব্দের গোড়ায় থাকেই না। তবে হ্ন (হ-এ দন্ত্য ন) এবং হ্ণ (হ-এ মূর্ধন্য ণ) বিষয়ে যেটা মজার কথা তা হল, এদের ব্যঞ্জনদুটো আমাদের উচ্চারণে জায়গা-পালটাপালটি করে নেয়।"

"তার মানে?"

"মানেটা দ্যাখো না। আগে হ পরে ন তো দুটোতেই? কিন্তু আমরা তো 'চিহ্নো' 'অপরাহ্নো' উচ্চারণ করি না। সে করা ভারী শক্ত। খুব শুদ্ধ করে বললে আমরা 'বলি 'চিন্‌হো' 'অপরান্‌হো'। ন-টা আগে চলে আসে, হ-টা পরে চলে যায়। ধ্বনির এই জায়গা-বদলাবদলির নাম ভাষাবিজ্ঞানে 'বিপর্যাস'। ইংরেজিতে মেটাথিসিস।"

ভণ্টু হঠাৎ হাত তুলে বলল, "আমাদের ক্লাসের ছেলেরা তো সোজাসুজি 'চিন্নো' 'মধ্যান্নো' বলে, 'ভিন্ন' 'মিষ্টান্নে'র মতোই।"

হিগিনকাকু ক্ষমার সুরে বললেন, "আহা, বেশিরভাগ লোকই তাই বলে। এই ধর না, আরেকটা যুক্তব্যঞ্জন—ঐ 'ক্ষ্ম'। আমরা ক'জন 'ব্রাহ্মণ'-কে 'ব্রাম্‌হোন' বলি? বেশিরভাগই বলি 'ব্রাম্মোন',-'ব্রহ্মা' (ব্রহ্মা), 'ব্রম্মোদেশ'। শুদ্ধ অতি-সচেতন উচ্চারণে এখানেও 'হ' আর 'ম'-এর জায়গাবদল হয়। কিন্তু স্বাভাবিক উচ্চারণ দাঁড়ায় ঐ 'ম্ম'।"

তারপর একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন, "হ বেচারার কপালটাই ওইরকম। স্প্যানিশে সে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে থাকলে উৎখাত হয়, আমাদের বাঙালদেশে কথার গোড়ায় সে উবে যায় —'অয় অয় Zানতি পার না'-তে যেমন, ইংরেজিতেও শব্দের মাঝখানে সে খসে যেতে চায়—আমরা যাকে বলি 'পারহ্যাপস', ওরা তাকে বলে 'প্র্যাপ্‌স্'।" হঠাৎ খুব নরম সুরে বললেন, "এবার তবে ঐ ব্যাটাদের ধরব?"

"কাদের?" ভণ্টু আর বাবা হতভম্ব।

"ঐ পলাতক ফলা-দের।" বলে আবার যে সেই চোখ বুজলেন তা অচিরেই নাকের ডাকের সংগত নিয়ে অন্যরকম চেহারা নিল। ভণ্টুরা পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

বাচস্পতি

সহজে ইংরেজি

চম্বল কলকাতায় নেই

এ বছর চম্বলদের পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় চম্বলকে দেখা যাবে না, কারণ চম্বল কলকাতায় নেই, নদীয়া জেলার কোনো-এক গ্রামে তার বন্ধু রবির দেশের বাড়িতে সে গিয়েছে দেড়শো বছরের পুরনো পারিবারিক দুর্গাপুজো দেখতে।

At first Chambal was not very keen on going.

"It's your family puja, you know," he said. "You'll have a great deal to do. I'd hate to be hanging around, doing nothing."

"Oh, you needn't worry about that. I never have much to do. I'm not considered old enough to be of much use. It'd be great fun to have you along."

Chambal still had his doubts.

"Suppose I do come along, what do I do when I get there?"

Rabi explained to him that there was always a lot going on in the house during the pujas.

"When we arrive we'll find the place full of interesting people. You'll like talking with them. There are some very old men in the village, for example. They're there every year, talking about old times. I find their talk fascinating. To listen to them, you'd think everything was perfect when they were young. When we are old we'll also think like that, perhaps."

Chambal asked, "Is it true that people live much longer in the villages?"

"I don't know," Rabi replied. "At least they look much older. There is a man in our village who looks at least a hundred. But he has looked like that ever since I've known him."

Chambal said, "Why don't you ask him his age?"

Rabi said, "When I see him next I'll ask him how old he is. But I don't think he'll be able to tell me. When you grow very old you tend to forget your age."

শেষ পর্যন্ত চম্বলের যাওয়াই ঠিক হল। বাবাও তাকে যেতেই বললেন।

"I think you'd better go with your friend, Chambal," he said. "It should be an interesting experience for you. I don't think you should miss an opportunity like this. I wish I could come with you, too. When you come back, I'll expect you to tell us all about it."

এবারেও আবার দ্যাখো, ভবিষ্যৎকালের কথা বলতে ক্রিয়াপদের বর্তমানকালের রূপ কখনও-কখনও ব্যবহার করা হয়।

What do I do when I get there?
When we arrive we'll find the place full.
When we are old we'll think like that.
When I see him I'll ask him how old he is.
When you come back I'll expect you to tell me all about it.

প্রসাদ

চেনা-অচেনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

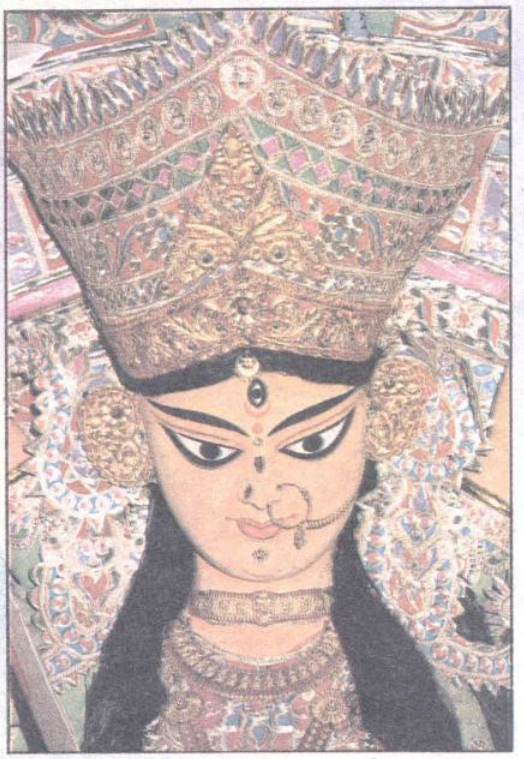

আলোকচিত্র : তিমির দত্ত

অনেক দুঃখ দিয়েছ মা,
এবার একটু ক্ষান্তি
দাও যদি তো অভাগারা
পাই একটু শান্তি।

দু'দিন খরায় জ্বলেপুড়ে
বানে গেলাম ভেসে,
আকাশ তবু গোমড়ামুখো,
তাও মানলাম হেসে।

এবার শুধু এই মিনতি,
একটুখানি হাসো।
এসো সাদা মেঘের ভেলায়
সদাই যেমন আসো।

তেমনি এসো শিউলি কাশে
ছড়িয়ে খুশির হাওয়া।
উড়ু-উড়ু মন চাইবে,
কোথায় যেন যাওয়া!

যে যাবে যাক্ পাহাড় কিংবা
দূরে সাগর-তীরে।
আশ মিটবে আমার, যদি
থাকি নিজের নীড়ে।

চেনা যা যা আসছি দেখে
বছর বছর ধরে,
জাদুর ছোঁয়ায় দেবে শরৎ
তা-ই অচেনা ক'রে!
অচেনা আর অবাক মধুর
চিরনূতন ক'রে!

ছবি : অনুপ রায়

এবার পুজোয়

বুদ্ধদেব গুহ

"এবারে কিন্তু পুজোয় বেশি কিছুর বায়না কোরো না। মা বললেন।" শুনে শান্তু বলল, "কেন মা?"

"যা বাজার পড়েছে না! তোমার বাবা একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। তুমি এখন বড় হচ্ছ। বাবার সুবিধা-অসুবিধার কথা বুঝবে নিশ্চয়ই। কী? বুঝবে না?"

"হ্যাঁ।"

একটু চুপ করে থেকে শান্তু বলল, "এবার পুজোয় আমরা কোথাও যাব না মা?"

বেগুন কাটতে-কাটতে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে মুখ নিচু করেই মা বললেন, "বোধহয় না।"

"অনেকদিন আমরা কোথাও যাইনি, না?"

"অনেকদিন কোথায়? এই তো গতবছরের আগের বছরেই গেলাম না পুরীতে? এবারেও চিঠি তো লিখেছেন তোমার বাবা অমলকাকাকে, হাজারিবাগে। যদি একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, দিন পনেরোর জন্যে যাব।"

"হাজারিবাগ! যাচ্ছি আমরা? অনেক বাঘ আছে, না মা?"

মা হাসলেন। বললেন, "বাঘের জন্যে নাম হয়নি। বাঘ অবশ্য শুনেছি একসময় অনেকই ছিল। আসলে হাজারিবাগ মানে হাজার বাগিচা।"

"তাই? ইশ্‌শ্‌। আগে যদি জানতাম। কালই স্কুলে রণজয় হাজারবাঘের হাজারিবাঘের গল্প বলল। ওদের একটা বাড়ি আছে মা, হাজারিবাগের ক্যানারি হিল রোডে। খুব সুন্দর বাড়ি। বাগান। ও খুব গল্প করে।"

"নিশ্চয় ভালই হবে। শুনেছি ক্যানারি হিল রোড খুব বড়লোকদের পাড়া। তুই বড় হয়ে হাজারিবাগে একটা বাড়ি করিস শান্তু। আমার খুব ভাল লাগে। লাল মাটি, কালো পাথর, শালবন, রুখু-রুখু ভাব। জলও বড় ভাল ওসব জায়গার।"

শান্তু মাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল পেছন থেকে।

মা বললেন, "আঃ, করছিস কী? ছাড়্, ছাড়্।"

শান্তু বলল, "করে দেব, দারুণ একটা বাড়ি করে দেব মা তোমাকে। মস্ত বড় লোহার গেট থাকবে তাতে। পাগড়ি-পরা দরোয়ান থাকবে গেটে। বড়লোকদের বাড়িতে যেমন থাকে। কুকুর থাকবে। দুটো। মস্ত বড়। আর গাড়ি থাকবে। একটা। সাদা। ছোট্ট।"

"গাড়িও? বাঃ, বাঃ!"

মা হাসলেন ছেলের দিকে চেয়ে। সেই হাসিতে আনন্দ, গর্ব এবং ভয় মাখামাখি হয়ে গেল। শান্তুর দু' চোখে দু' চোখ রেখে চেয়ে রইলেন মা অনেকক্ষণ।

শান্তু বলল, "তুমি দেখো, আমি খুব বড়লোক হব, মা।"

"তাইই?" মা বললেন।

"হ্যাঁ। রণজয়দের চেয়েও বড়লোক।"

মা মুখ নিচু করে রইলেন।

"কলকাতায় বাড়ি করব, গাড়ি করব। হাজারিবাগে বাড়ি করব। বহরমপুরে আর থাকব না। বড্ড মশা এখানে।"

মা হেসে ফেললেন। বললেন, "বড়লোকই হবি ? আর কিছু হবি না ?"

"আর কী হব ? রোজ-রোজ তোমাকে মণিমাসিমার মতো ইয়া চওড়া লাল পাড়ের গরদের শাড়ি কিনে দেব, টেপ-রেকর্ডার, কালার টি· ভি·, আর ..."

"বড়লোক হওয়া তো সোজা।" মা বললেন।

"সোজা ? তাহলে বাবা হচ্ছে না কেন ?"

"কী জানি ! হতে চান না হয়তো।"

"চান না ? কী যে বলো মা ! বড়লোক হতে কে না চায় বলো ? রোজ ইলিশমাছ আর মাংস খাওয়া যেত। আর ছানাবড়া। আসলে, বড়লোক হতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয়। মতি আগরওয়ালার মতো। নিজের ঘাড়ে গুড়ের বস্তা নিয়ে নাকি ব্যবসা শুরু করেছিল। এখন দ্যাখো।"

"মানুষ হতে হলে তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট করতে হয় শান্তু। বড়লোক হওয়া সোজা। খুবই সোজা। চোর বদমাস গুণ্ডা ডাকাতরাও আজকাল খুব সহজে বড়লোক হতে পারে। কিন্তু উপায় থাকতেও বড়লোক না-হতে চাওয়ায় অনেকেই বেশি কষ্ট। তুই তোর বাবার মতো মানুষ হোস। মানুষ হয়ে, মানুষ থেকেও যদি বড়লোক হতে পারিস, তবে খুবই ভাল। না পারলে, মানুষই থাকিস। অমানুষ হয়ে বড়লোক হবার দরকার নেই।"

মায়ের সব কথা ও বুঝল না। সাদার উপর হালকা বেগুনি ডোরা-কাটা শাড়ি পরে আছেন মা। আঁচলের কাছটা ছেঁড়া। শরতের রোদ এসে পড়েছে জানালা দিয়ে শিউলি গাছের চুল ঝাঁপিয়ে। মৌটুসি শিস দিচ্ছে রঙ্গনের ঝাড় থেকে। কাঠটগরের ঝোপে দুটো বুলবুলি ঝাপটা-ঝাপটি করছে। মিনুদের বাড়ির রেডিওতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান হচ্ছে "শরৎ আলোর কমলবনে বাহির হয়ে/ বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে..."

মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল শান্তুর। পুজোর আগে যে রবিবার থেকে পুজোর কেনাকাটা শুরু হবে, সেই রবিবারেই ! এই সকালের রোদ, মায়ের না-হাসি না-কান্না মুখটি। মায়ের আঁচল-ছেঁড়া শাড়ি, মুসুরির ডালে কালোজিরে সম্বরা দেওয়ার গন্ধ।

মা বললেন, "বাবার দাড়ি কামানোর ব্লেড নেই শান্তু। বাজার থেকে ফিরেই চানে যাবেন। পরেশের দোকান কি খুলেছে ? বাজে ক'টা ?"

"ওই যে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। এতক্ষণে খুলে গেছে।"

"ডানদিকের ড্রয়ার থেকে পয়সা নিয়ে যা তো একবার। এক টাকার নোট আছে একটাই। খুচরো নিস না কিন্তু। ওই একটাকাটা নিয়েই যাস।"

শান্তু উঠল।

"কী ব্লেড জানিস তো ?"

"জানি, জানি," বলে টাকা নিয়ে শান্তু বেরিয়ে গেল।

গ্রাণ্ট হল রোডের বড় বড় মেহগনি গাছগুলোকে ভীষণ ভালবাসে শান্তু। বুড়ো ঠাকুর্দার চেয়েও অনেক বেশি বুড়ো এই গাছগুলো। বুড়ো মানুষরা খুব ভালবাসতে জানে। তাদের কাছে গেলেই ভাল লাগে ওর।

পেট্রোল পাম্পটার উল্টোদিকে ছোট একটি ঝুপড়িমতো। আগে লক্ষ করেনি। সামনে তক্তা পাতা, দুটি খুঁটির উপর। একটা কালো কেটলি ভেজা কয়লার ধোঁয়া-ওগরানো উনুনের উপরে বসানো। কয়েকটি ছোট-ছোট গ্লাস। নোন্তা আর মিষ্টি বিস্কুট।

এই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চড়েই যাতায়াত করে ও। কখনও মা'র সঙ্গে গেলে, সাইকেল-রিকশায়। নিজের পায়ে হেঁটে না চললে কোনো কিছুই ভাল করে নজর করা যায় না।

দোকানটার সামনে পৌঁছতেই ও চিনতে পারল দোকানিকে। সূর্য। সূর্য রায়। ওদের সঙ্গে পড়ত। খুবই বন্ধু ছিল শান্তুর। থাকত খাগড়াতে কোথাও। শান্তু কখনও ওদের বাড়িতে যায়নি। গতবছর সূর্যর বাবা পলাশির কাছে ট্রাক অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলেন হঠাৎ। তারপরই স্কুল ছেড়ে দেয় সূর্য। পড়াশুনোতে বেশ ভাল ছিল। বিশেষ করে ইংরিজি আর বাংলায়।

সূর্যর গায়ে 'এশিয়াড'-লেখা একটা নীলরঙা গেঞ্জি। খুবই ময়লা হয়ে গেছে সেটা। খাকি হাফপ্যাণ্ট। উবু হয়ে বসে উনুনে ফুঁ দিচ্ছিল ও। বাজে কয়লা। ওর চোখ ঠিক্‌রে জল বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু উনুন তবুও ধরছিল না। একজন সাইকেল-রিকশাওয়ালা বাঁ পায়ের সঙ্গে ডান পা জড়িয়ে তক্তায় বসে ছিল চায়ের অপেক্ষায়। 'ধুস্' বলে সে রাগ করে উঠে চলে গেল।

একমাত্র খদ্দেরও চলে যেতে সূর্য মনমরা হয়ে সেদিকে একবার তাকাল। তারপর শান্তুকে বলল, "একটু বসুন বাবু। এক্ষুনি আগুন জ্বলে যাবে।"

শান্তু বলল, "কী রে সূর্য, চিনতে পারলি না ?"

"কে ?" যেন ঘুম ভেঙে বলল সূর্য। তারপর শান্তুকে চিনতে পারল। মুখটা কালো হয়ে গেল মনে হল। শান্তু খদ্দের নয়, বন্ধু। বউনি হল না এখনও। কেট্‌লিটা নামিয়ে রেখে উনুনের সামনে উবু হয়ে বসে, তালপাখার হাওয়া করতে লাগল।

"পড়াশুনো ছেড়ে দিলি ? কোথায় হারিয়ে গেছিলি তুই ?"

"সত্যিই হারিয়েই গেছিলাম।" মাথা নোয়াল সূর্য পাখা করতে করতেই। বলল, "কী হবে ? পড়াশুনো করে কী হবে বল।"

শান্তু অবাক হয়ে বলল, "সে কী রে ! পড়াশুনোই তো সব।"

সূর্য ডান হাতে হাওয়া করতে করতে বাঁ হাতে কয়লাগুলো নেড়েচেড়ে দিতে লাগল। "কী রে, কথা বলছিস না যে ? পড়াশুনো না করলে কি মানুষ হওয়া যায় ? এই চা বিক্রি করে কী করবি তুই ? সারা জীবন..."

সূর্য তবুও সে-কথার কোনো উত্তর দিল না। খানিক বাদে বলল, "কেমন আছিস রে ? পুঁটে কেমন আছে ? এ-বছরে ইংরিজি আর বাংলায় ফার্স্ট কে হল রে ? মাস্টারমশাইরা আমার কথা বলেন ? তোরা ? নাকি সবাই ভুলে গেছিস ?"

শান্তু মাথা নেড়ে জানাল যে, না, কেউই ভোলেনি। বলল,

"তোরা এখনও খাগড়াতেই তো থাকিস ? আমাদের বাড়ি তো কাছেই। একদিন চলে আয়। আমিও আসব এখানে যখনই সময় পাই।"

"তুই-ই আসিস। আমি সকাল ছ'টাতে এখানে আসি, রাত দশটাতে যাই। সবসময়ই এখানে।"

"সে কী রে ? খাস কোথায় ? চান-টানও করিস না ? এক জামাকাপড়ে সারা দিন ?"

"মা ভোর চারটেতে উঠে রুটি বানিয়ে দেন। রুটি আর গুড় নিয়ে আসি। সব খদ্দের পুরো গেলাস চা খায় না। তাদের কাপের তলানি অনেক থাকে। চা বিনি পয়সাতে পেয়ে যাই..."

শান্তুর খুব ইচ্ছে করল বলে যে, সূর্য তুই রোজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে এসে খেয়ে যাস, মাকে বলব আমি। কিন্তু তা না বলে বলল, "তোর কাকারা কেমন আছেন ?"

"ভাল।"

"ওইখানেই থাকেন ? মানে, খাগড়াতেই ?"

"হ্যাঁ। মা'কে আর আমাকে চলে যেতে বলেছিলেন। তাই...এখন আমরা আছি বড়মামার কাছে। নদীর দিকে, ঘাটে যাবার রাস্তা থেকে বেরিয়েছে গলি, সেই গলিতে। মস্ত অশথগাছ আছে একটা..."

শান্তু বলল, "আমি এখন চলি রে। বাবার দাড়ি কামানোর ব্লেড আনতে বেরিয়েছি।"

সূর্য হাসল, উনুনে হাওয়া করতে করতেই। বলল, "আসিস আবার।"

তারপর বিড়বিড় করে আপনমনেই বলল, "কয়লাগুলো কাঁচা, ভিজে, আগুন ধরে না এতে। বাজে !"

বাড়ি ফিরে গিয়ে শান্তু মা'কে বলল সূর্যর কথা। শান্তুরা বড়লোক যে নয়, তা শান্তু জানে। কিন্তু কতখানি যে গরিব তা জানে না। প্রত্যেকদিন দুপুরে সূর্যকে খাওয়ানোর কথা মা'কে বলবে কি বলবে না বুঝতে পারল না। মা রান্নাঘরে চলে গেছেন রবিবারের সকালের জলখাবার করতে। রবিবার সকালে বিশেষ কিছু একটা করেনই মা।

বাবা বাজার থেকে ফিরে এলেন। রবিবারের বাজার বাবা নিজে করেন। এসে, ছোট্ট খাওয়ার টেবলে বসে বললেন, "বল্ রিপোর্টার, সারা সপ্তাহের খবর শুনি।"

"খবর ?" বলেই শান্তু চুপ করে গেল।

"কী হল রে ? মনে হচ্ছে, চেপে যাচ্ছিস কিছু। তা এবার পুজোয় কী কী চাই ? জিনের প্যান্ট তো নিশ্চয়ই চাই। আর..."

"বাবা, সূর্য...সূর্য না..."

"সূর্য ? সে কে ?"

"আমার বন্ধু। তোমরা চেনো না। চায়ের দোকান দিয়েছে বড় রাস্তায়।"

"চায়ের দোকান ? পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ? ব্যবসা করে বড়লোক হতে চায় বুঝি ?"

"নানা। না।" বলল শান্তু। ওর বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অথচ সেই কষ্টের কথা বলতেও পারছিল না বাবা কিংবা মা'কে। সূর্যকে যে ওঁরা কেউই চেনেন না।

"কী না ?"

"নাঃ।" শান্তু বলল। "সূর্য আসলে সূর্য ; তার কোনো

দোষ নেই। দোষ কয়লারই, সূর্যর নয়। বাজে কয়লা, ভেজা কয়লায় আগুন জ্বলে না কখনও। কয়লাটা ভাল হওয়াটাই আসল কথা। আসল কথা...।"

বাবা একদৃষ্টে শান্তুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "ঠিক। কয়লাটাই আসল। এইজন্যেই চারদিকে এরকম হচ্ছে, চলছে, জানিস...আজকালকার কয়লা বড় বাজে হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর..."

শান্তু ভাবছিল, এবার পুজোয় ও জিনিস নেবে না, টাকা চেয়ে নেবে মা-বাবার কাছ থেকে। সূর্য আর ও সমান ভাগে ভাগ করে জামাকাপড় কিনবে। সূর্যর মায়ের জন্যেও ওই টাকা থেকে শাড়ি কিনবে একটা। আজ সূর্যর যা হয়েছে, কাল শান্তুর নিজেরও তো তাই-ই হতে পারে ! মা-বাবাকে কিছুই বলতে না পেরে আরও অস্বস্তি লাগতে লাগল ওর।

মা বললেন, "বসে পড় শান্তু। আজ চিঁড়ের পোলাও করেছি। নিয়ে আসছি গরম-গরম।"

আজ সকালে চিঁড়ের পোলাও, দুপুরে কচি পাঁঠার মাংস, রাতে খিচুড়ি। আর সূর্য ? সব দিক দিয়েই শান্তুর মতো হয়েও শুধু শুকনো রুটি আর একটু গুড় আর খদ্দেরদের এঁটো চা...

"পুজো তো এসে গেল শান্তুবাবু। হাজারিবাগে যাবে নাকি এবারে ?" বাবা বললেন।

উত্তর দিল না শান্তু। ওর মাথার মধ্যে চিঁড়ের পোলাও এবং হাজারিবাগ বড় গোলমাল করতে লাগল।

পুজো এসে গেল।

এবারের পুজোটা শান্তুর বড়ই খারাপ যাবে।

কিংবা, কে জানে, হয়তো সবচেয়েই ভাল যাবে। এর আগে তো কখনও অন্য কারও সঙ্গে নিজেরটা ভাগ করে নেবার আনন্দ যে কী, তা ও জানেনি !

এবারেই জানবে। প্রথম।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে ? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না ?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন, বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

নেপোলিয়নের নবজীবন

রেবন্ত গোস্বামী

সাতসকালে তাঁর বৈঠকখানায় হাজির প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবল-খেলোয়াড় ও প্রতিবেশী নেপোলিয়ন বিশ্বাসের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন বৈজ্ঞানিক সাত্যকি সোম। তারপর চিন্তান্বিতভাবে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ন্যাপলা। বয়স কমানোর কোনো ওষুধ তো আমি আবিষ্কার করিনি। 'সময়ের গতিবর্তন' নামে আমার একটা প্রবন্ধ পড়ে অনেকে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারাই এসব রটাচ্ছে। বিজ্ঞান কখনো প্রকৃতির নিয়মকে উলটে দেয়নি। সেই নিয়মকেই নিজের কাজে লাগিয়ে মানুষের অসহায়তা দূর করেছে। তোমার মাথায় এসব উদ্ভট চিন্তা এল কী করে? আরে, বয়স কমাতে পারলে আমি নিজেই তো বাচ্চা ছেলে হয়ে গবেষণা-টবেষণা ছেড়েছুড়ে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে মেতে উঠতাম।"

নেপোলিয়ন নাছোড়বান্দার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "না স্যার, আপনার ল্যাবরেটরিতে সময়কে পিছু হঠানোর যন্ত্র আছে, একথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। আমাকে অন্তত বাইশ বছর বয়স কমিয়ে দিন। আমার বয়স এখন চল্লিশ। আমি আবার আঠারো বছরে ফিরে গেলে নতুন উদ্যমে ফুটবল খেলতে শুরু করব। আগের অভিজ্ঞতা থাকাতে তখন খেলা আরও নিখুঁত হবে। আরো কত নাম হবে তখন। হয়তো পৃথিবীর সেরা ফুটবলার আমিই হব। নইলে...আজ তিন বছর খেলা ছেড়েছি। এর মধ্যেই দুর্ধর্ষ নেপোলিয়ন বিশ্বাসের নাম দেশের লোক ভুলতে বসেছে।" কথাগুলো বলতে নেপোলিয়নের গলাটা যেন ভারী হয়ে এল।

সাত্যকি সোম বললেন, "তুমি ভুল বুঝছ। সময়কে পিছু হঠানো মানে আগের সেই সময়টাকে ফিরিয়ে আনা। রেকর্ডকে পিছিয়ে দিয়ে চালানোর মতন। এতে ওসব অভিজ্ঞতা-টভিজ্ঞতাও পিছিয়ে কমে যাবে, ঐ বয়সে যেমন ছিল।"

নেপোলিয়ন বিশ্বাস একটু ভেবে বললেন, "তা হোক, আমি আবার সেই বয়সে ফিরে যেতে চাই।" এই বলে কাতরভাবে সাত্যকি সোমের হাত দুটো চেপে ধরলেন।

সাত্যকি সোম অসহায়ভাবে তাঁর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে এক কবি ছিলেন। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কবিতা না পড়ে থাকতে পারো, কিন্তু 'ইচ্ছাপূরণ' নামে তাঁর একটা গল্প পড়েছ কি?"

নেপোলিয়ন বিশ্বাস লজ্জার হাসি হেসে বললেন, "স্যার, আমি লেখাপড়া বিশেষ করিনি। আই-কিউ থেরাপি সেন্টারে গিয়ে মাঝে-মাঝে ব্রেনটাকে কাজ চালানোর মতো করে নিই। জানেন তো, আমার জীবনে খেলাটাই সব।"

সাত্যকি সোম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর সোফা থেকে উঠে পড়ে বললেন, "ঠিক আছে। তোমার বয়স আমি বাইশ বছর কমিয়ে দেব। এসো আমার সঙ্গে।"

নেপোলিয়ন বিশ্বাস প্রায় কান পর্যন্ত ছড়ানো হাসি হেসে লাফাতে-লাফাতে ডক্টর সোমকে অনুসরণ করলেন।

ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করে সাত্যকি সোম পেছন ফিরে নেপোলিয়নের দিকে চেয়ে শেষবারের মতন বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "আর একবার ভেবে দেখো, ন্যাপলা। তোমার এই বয়সের এত সম্মান, এত সম্বর্ধনা, পুরস্কার, পদক—সব কিন্তু বয়স কমার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে...।"

তাঁর কথা শেষ না হতেই নেপোলিয়ন উত্তেজিতভাবে মেঝেতে পা ঠুকে বলে উঠলেন, "ফ্রি-কিক মারি ওসব সম্মানের মাথায়।" তারপরেই লজ্জিতভাবে সাত্যকি সোমের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। বুঝতেই তো পারছেন...।"

সাত্যকি সোম মৃদু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" বলেই দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একদিকে দুই দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত একটা পর্দা সরে গেল। নেপোলিয়ন দেখলেন, প্রায় পনেরো ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট উঁচু একটা রকেটের আকারের বস্তু ঘরের ঐ-দিকটা জুড়ে আছে। প্লেনের মতো একটা ছোট

বক্তৃতা আর ধোপার খাতায়–
দুয়ের মধ্যে মিলটা কোথায় ?

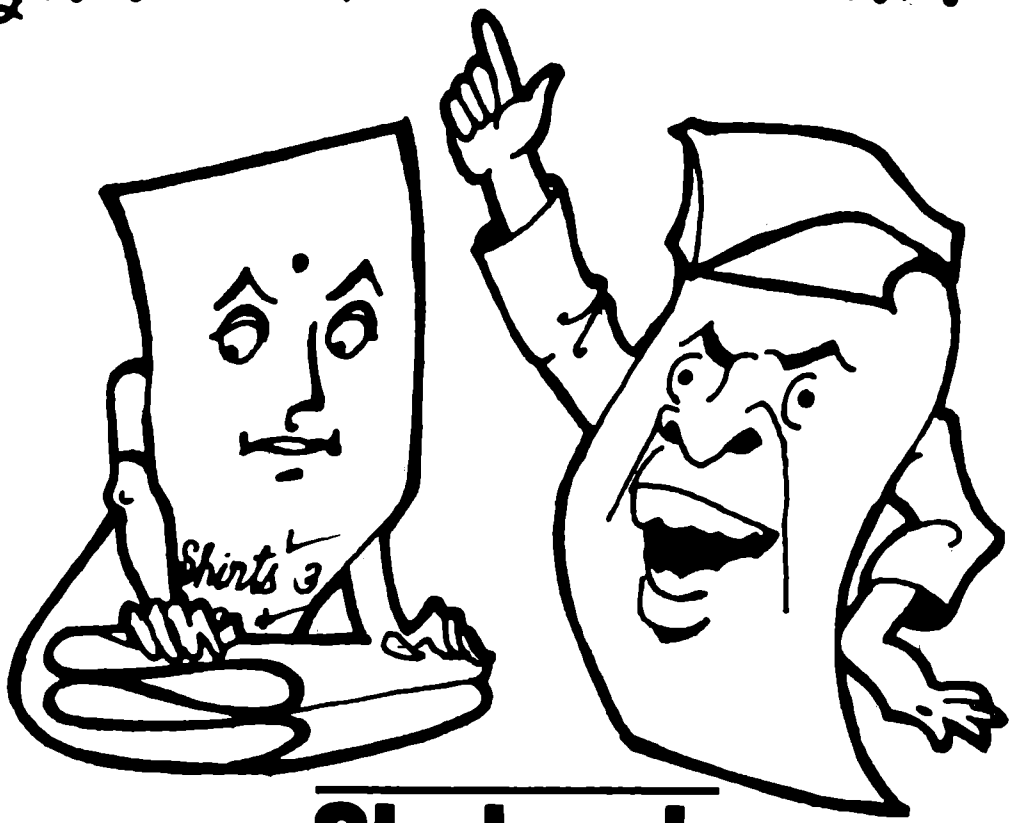

Chelpark

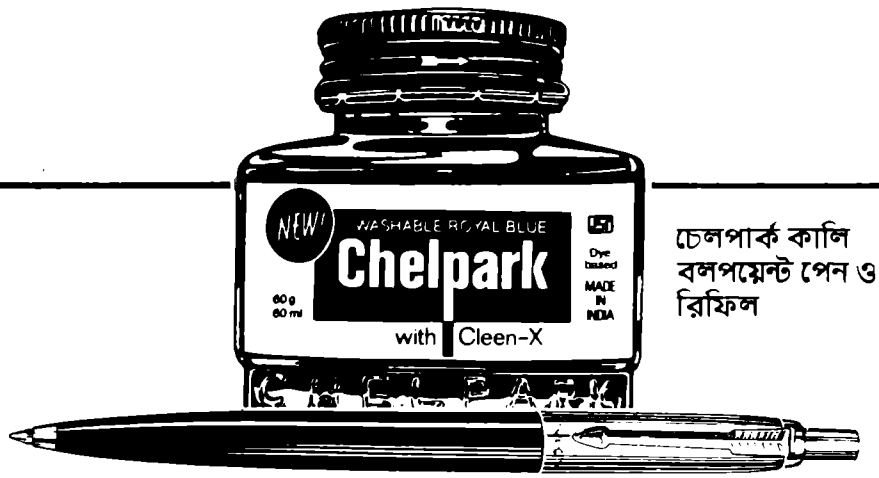

চেলপার্ক কালি
বলপয়েন্ট পেন ও
রিফিল

যে নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের
আঙুলের ডগায়।

CCL-1654 A

দরজাও আছে ওটার ভেতরে ঢোকার জন্যে।

সাত্যকি সোম নেপোলিয়ন বিশ্বাসের দিকে চেয়ে বললেন, "ঢুকে পড়ো এর মধ্যে মাথা নিচু করে। ভেতরে সুন্দর নরম বিছানা আছে, তাতে শুয়ে পড়ো। কিছুক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখব। ভেতরে মহেন্দ্র আছে। ও তোমাকে ঠিক সময়ে ডেকে তুলবে।"

নেপোলিয়নের হতভম্ব চাহনি দেখে সাত্যকি সোম হেসে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। মহেন্দ্র একটা রোবট। মুখের চেহারাটা মহেঞ্জোদারোর মূর্তির মতন বলে ওটার নাম মহেন্দ্র রেখেছি।"

নেপোলিয়ন নির্দ্বিধায় রকেটটাতে প্রবেশ করতেই সাত্যকি সোম দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোতে নেপোলিয়ন দেখলেন, এক কোণে মহেন্দ্র বসে আছে উবু হয়ে। তাঁর মতন লোকেরও হঠাৎ গা-টা ছমছম করে উঠল। তবে সেটা এক মুহূর্তের জন্যে। বিছানায় শুয়ে দেখলেন, সত্যিই সেটা পালকের মতো নরম। শোওয়ামাত্র একটা যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ শুনতে পেলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

হঠাৎ কিসের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যেতেই নেপোলিয়ন দেখলেন, মহেন্দ্র তাঁর হাতে মৃদু টোকা দিতে দিতে ধাতব গলায় একঘেয়েভাবে বলে চলেছে, "উঠুন···উঠুন···উঠুন···"

খঞ্জনি ঠোকার মতন সেই আওয়াজ শুনে নেপোলিয়নের হাসি পেয়ে গেল। ধড়মড় করে উঠতেই রকেটটা চারপাশে ফুলের পাপড়ির মতন খুলে গেল। আর নেপোলিয়ন দেখলেন, তিনি নীল আকাশের নীচে একটা ফাঁকা জায়গায় ঐ খুলে-যাওয়া রকেটের শয্যার ওপর বসে আছেন। মহেন্দ্র তার পাশে জাদুঘরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে।

নেপোলিয়ন মহেন্দ্রর দিকে চেয়ে কেঠোহাসি হেসে বললেন, "বাব্বাঃ, কয়েক মিনিট ঘুমিয়েছি। এর মধ্যে কোথায় এনে ফেলেছেন ডক্টর সোম!"

বেশির ভাগ রোবটের মতো মহেন্দ্রও হাসতে জানে না, কিন্তু জ্ঞান দিতে ওস্তাদ। ঘণ্টার মতন ঢঙঢঙে গলায় বলল, "কয়েক মিনিট কাকে বলছেন? আপনি কতকাল ঘুমিয়ে ছিলেন, জানেন? পৃথিবীর মাপে তিন হাজার সাতশো পঁচিশ বছর চার মাস একুশ দিনের চেয়ে দু-চার ঘণ্টা বেশি। এই দেখুন আমার হাতের ক্যালকুলেটরে সংখ্যাটা। আপনাকে সেই পৃথিবীর দুনিয়া থেকে আলোর গতিতে এমন এক জগতে এনে ফেলা হয়েছে, যেখানে সবই পৃথিবীর মতন। তফাত শুধু, এখানে সব কিছুই উলটো দিকে পিছিয়ে চলে।"

মহেন্দ্রর কথায় হতবাক হয়ে গেলেন নেপোলিয়ন বিশ্বাস। তারপরেই একটা দারুণ রাগ আর হতাশায় তাঁর দেহের শিরা দিয়ে যেন একই সঙ্গে আগুন আর বরফের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। তাঁকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন সাত্যকি সোম! একবার তাঁকে হাতের কাছে পেলে···

সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন বিশ্বাসের মনে হল সাত্যকি সোম এখনকার পৃথিবীর হিসাবে তিন হাজার বছর আগে ছিলেন। অর্থাৎ নেপোলিয়ন বিশ্বাস যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা যেমন অতীত ছিল।

মহেঞ্জোদারোর কথা মনে হতেই মহেন্দ্রর দিকে আবার তাকালেন তিনি। সে বলল, "প্রভু আপনার জন্যে একজন গাইড ঠিক করে দিতে বলেছেন।" এই বলে মুখে একটা যন্ত্র লাগিয়ে কী একটা অদ্ভুত ভাষায় চিৎকার করতে লাগল সে।

প্রভু—অর্থাৎ সাত্যকি সোম। তাঁর কথা মনে হতেই নেপোলিয়নের আপাদমস্তক জ্বলে যেতে লাগল। কিন্তু অসহায়ের মতন বসে থাকা ছাড়া তাঁর কিছু করার নেই।

সামনে চোখ পড়তেই দেখলেন, তিনি যে মাঠে বসে আছেন, তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে একটা ছোট্ট নদী। নদীর পাড়ে সাদা কাশফুলগুলো হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন নেপোলিয়ন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। তিনি দেখলেন, কোথা থেকে একটা বক উলটোভাবে উড়তে উড়তে এসে নদীর জলে বসল। তারপর জলের দিকে ঠোঁট নামিয়ে ফাঁক করতেই মুখের ভেতর থেকে একটা জ্যান্ত মাছ জলে লাফিয়ে পড়ল।

তারপরে একটার পর একটা আজব দৃশ্য। একটা ভিজে কাপড়পরা লোক উলটোদিকে হাঁটতে হাঁটতে নদীর জলে ডুব দিল। ডুব দিয়ে যখন সে উঠল, নেপোলিয়ন দেখলেন, তার শরীরে এক ফোঁটা জল নেই। কাপড়ও শুকনো খটখটে।

অন্যদিকে নজর পড়তেই দেখলেন, কয়েকটা গাড়ি সাঁত সাঁত করে উলটো দিকে ছুটে চলে গেল। ফিল্মকে উলটোদিকে চালিয়ে পর্দায় ফেললে যেমন দেখতে লাগে, এসব কাণ্ডকারখানাও নেপোলিয়ন বিশ্বাসের কাছে সেরকমই লাগল।

এর মধ্যেই মহেন্দ্রর ডাকে একজন গাইড এসে হাজির হয়েছে। বোঝা গেল, সেও একটা রোবট। এই গ্রহেরই। সে এসে কিচমিচ করে কী সব বলতে শুরু করতেই, মহেন্দ্র তার মুখে ছাঁকনির মতন কী একটা এঁটে দিল। নেপোলিয়নকে বলল, "এটা এস্-সি বা স্পিচ কনভার্টার। কথার আয়না বলতে পারেন। এবার ওর কথা বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আপনিও ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মুখে এটা লাগিয়ে কথা বলবেন।" বলে তাঁর হাতেও মহেন্দ্র একটা ছাঁকনি দিল।

নতুন গ্রহের রোবটটা এসব দেখে এখন পরিষ্কার বাংলায় বলল, "ও, আপনারা বুঝি উলটো জগৎ থেকে এসেছেন? আপনাদের রকমসকম দেখে আগেই সন্দেহ হয়েছিল। আমার নাকের গ্যাস অ্যানালাইজার দিয়ে তখন থেকে বুঝতে পারছি, এই ভদ্রলোক নাক দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে অক্সিজেন না ছেড়ে তার উলটোটাই করে যাচ্ছেন।"

নেপোলিয়ন রোবটের কথায় রেগে গিয়ে মুখে যন্ত্র লাগিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই করছি। আমি তো আর গাছ নই, মানুষ।"

এই রোবট মহেন্দ্রর মতন গোমড়ামুখো নয়। হাসতে পারে। হো-হো করে হেসে বলল, "আবার সেই উলটো রকম কথা। যাই হোক, আমার নাম দুশো চার পঞ্চাশ। দুশো চার নাম, আর পঞ্চাশ পদবী। এখানে সকলের নাম পদবীই সংখ্যা দিয়ে। এবার চলুন, আপনাদের ঘুরিয়ে সব দেখাই। কিন্তু···"

দুশো চার মাথা নিচু করে কী ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "আপনাদের মতন নাক-বরাবর হাঁটলে এখানকার লোকে অবাক হয়ে তাকাবে। পাগল ভেবে বুড়ো লোকেরা হয়তো পিছু লাগতে পারে, ইঁট-পাটকেলও আপনাদের গা

থেকে টানতে পারে।"

নেপোলিয়নের মাথার মধ্যে সব কিছু যেন ঘুরপাক খেতে লাগল এসব কথা শুনে। হুঁট-পাটকেল ছোঁড়া হয়, এটাই তো তিনি জানেন। সেগুলো আবার গা থেকে টানা হয় কী করে!

দুশো চারের সমস্যার সমাধান যে সাত্যকি সোমই করে রেখেছিলেন, মহেন্দ্রর কথায় নেপোলিয়ন সেটা বুঝতে পারলেন। মহেন্দ্র বলল, "আমি ব্যাক গিয়ারে চোখের পেছন দিকেও হাঁটতে পারি। আর এই মানুষটার জন্যে একটা খোলস পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রভু। গায়ে পরে নিলে মনে হবে, চোখ নাক কপাল সব এখন যেদিকে আছে তার উলটোদিকে। কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।"

দুশো চার হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "বাঃ, তাহলে তো ভাবনাই নেই। এতে ভালই হবে, মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলা যাবে।"

নেপোলিয়ন বিশ্বাস ব্যাজার মুখে সেই উদ্ভট ডুবুরির পোশাক পরে দুই মূর্তিমানের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। মনে মনে সাত্যকি সোমের শ্রাদ্ধ করতে করতে ভাবতে লাগলেন, বয়স না কমিয়ে বুড়ো নিশ্চয় ইচ্ছে করে তাঁকে এই গ্রহে পাঠিয়ে কোনো গবেষণা করছেন। থুড়ি, গবেষণা করছিলেন সেই তিন হাজার বছর আগে।

রাস্তায় দোকানপত্র খোলা। লোকে জিনিসপত্র হাতে নিয়ে পিছু হটতে-হটতে দোকানে ঢুকছে। তারপর সেগুলো দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। দোকানের ঘড়িগুলোর কাঁটা নীচে থেকে দেখা সিলিং ফ্যানের ব্লেডের মতো উলটো দিকে ঘুরছে।

কিছু দূর গিয়ে ভিজে মাটি দেখে দুশো চার বলল, "বৃষ্টি উঠবে বোধহয়। তবে বেশিক্ষণ হবে না। অল্প জল আছে।"

নেপোলিয়ন তাকিয়ে দেখলেন, আকাশ পরিষ্কার, একটুও মেঘ নেই। তিনি অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মঝ্‌মঝ্‌ শব্দে চেয়ে দেখলেন, চারদিকের মাটি থেকে ফোয়ারার মতন জলের ধারা সোজা আকাশে উঠে যাচ্ছে। ছুটে বারান্দায় আশ্রয় নিতে গেলে দুশো চার হেসে ফেলল। বলল, "ভিজলে তো আগেই ভিজে থাকতেন। এতক্ষণে শুকিয়ে যেত।"

নেপোলিয়ন অবাক হয়ে দেখলেন, চারপাশের মাটি শুকনো। শুধু আকাশে কিছু মেঘ আস্তে আস্তে একপাশে সরে যাচ্ছে।

রাস্তার মধ্যে একটা সুন্দর বাচ্চা ছেলেকে দেখে নেপোলিয়ন আদর করে তার পিঠে একটা টোকা দিলেন। সেদিকে নজর পড়তে দুশো চার বলে উঠল, "বেচারা! একেবারে বাচ্চা হয়ে গিয়েছে। আর বেশিদিন আয়ু নেই।"

নেপোলিয়ন বিশ্বাসের মাথা এবার বেশিরকম ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি মাথা টিপে বসে পড়লেন।

মহেন্দ্র দুশো চারের কানে কানে কী বলল, তাই শুনে দুশো চার বলল, "সে তো নিশ্চয়। তোমাদের গ্রহের এই মানুষটা আস্তে আস্তে এই গ্রহের মানুষের মতনই হয়ে যাবে। উলটো পোশাকটা একটু পরে খুলে নিলেই হবে। তখন আমাদের নিয়মে চলতে কোনো অসুবিধেই হবে না। বাইশ বছর আগে ওর বয়স যখন আঠারো বছর হবে, তখন আবার ওকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবে।"

এই কথা শুনে নেপোলিয়ন বিশ্বাস লাফিয়ে উঠলেন। শরীর থেকে খোলসটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে পৃথিবীর নিয়মে সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে বললেন, "না, না, না! আমি উলটো দিকে যেতে চাই না। সামনের দিকে চলতে চাই। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে—অতীতে নয়। বয়স বাড়ুক। বড় হয়েই মরতে চাই, ছোট হয়ে নয়। কিছুতেই নয়!"

টুং করে একটা শব্দ হতেই নেপোলিয়ন বিশ্বাসের ঘুম ভেঙে গেল। রকেটের দরজাটা খুলে যেতেই দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন সাত্যকি সোম। বললেন, "বেরিয়ে এসো।"

নেপোলিয়ন অবাক হয়ে দেখলেন, ডক্টর সোম সোজা ভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, "তোমার বয়স এখন আঠারো বছর। তুমি এখন নতুন করে খেলোয়াড়-জীবন শুরু করতে পারো। তবে সেইসঙ্গে তোমার শিক্ষাজীবনও। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর ভাল কথা, তোমাকে একটা নতুন নাম নিতে হবে। লোকে জানবে, বিখ্যাত নেপোলিয়ন বিশ্বাস নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। দেখো, তোমার আত্মজীবনী বা পদকগুলোকে নিজের বলে দাবি করে বোসো না যেন। তাহলে লোকে তোমাকে পাগল মনে করে দূর-দূর করবে। খেলায় সুযোগ দেওয়া তো দূরের কথা।"

নেপোলিয়ন বিশ্বাস এবারে প্রায় কেঁদে ফেলে সাত্যকি সোমের হাঁটুদুটো চেপে ধরলেন। তারপর কাতর কণ্ঠে বললেন, "না, না। আমি ছোট হতে চাই না। আপনি দয়া করে আমাকে আমি করে দিন। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।"

সাত্যকি সোম অনেকক্ষণ মিটিমিটি হাসলেন নেপোলিয়নের দিকে চেয়ে। তারপর তাঁর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, "তুমি যা ছিলে, তাই আছ। নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখো। আর ভাল কথা, তুমি যে আমার কাছে এসেছ, সেটা কী করে লোকে জেনে ফেলেছে। নেপোলিয়ন বিশ্বাস বলে কথা! এইমাত্র এক ভদ্রলোক টেলিফোন করেছিলেন। তোমাকে তাঁর ভীষণ দরকার। তোমার ওপর একটা ডকুমেন্টারি ছবি তুলবেন। তুমি তখন বোধোদয় ক্যাপসুলে ঘুমোচ্ছিলে। যাই হোক, তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে রেখেছি, এই নাও।"

সাত্যকি সোম একটা চিরকুট নেপোলিয়নের হাতে দিলেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে নেপোলিয়ন বিশ্বাস জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বর্ষা শেষ হয়ে শরতের আলোতে চারদিক ঝলমল করছে। বর্ষার পরে শরৎ না এসে যদি গ্রীষ্ম আসে! মনে হতে আপন মনেই হেসে ফেললেন তিনি।

এই শরতের সকালে পৃথিবীটাকে খুব ভাল লেগে গেল নেপোলিয়নের। তিনি ভাবলেন, সাত্যকি সোমের বাড়ি থেকে বেরিয়েই তিনি রাস্তায় নামবেন, ঠিক যে-ভাবে নাচতে নাচতে মাঠে নামতেন। তারপর আস্তে আস্তে ছুটতে থাকবেন। সামনের দিকে।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

বনের রাজা

সুবোধ ভট্টাচার্য

পিকুর ঘুম এত ভোরে ভাঙে না। মর্নিং-স্কুল হলে তো ডেকে-ডেকে হয়রান হতে হয়। কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙতে চায় না। কেবল দু'চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে। খানিক বাদে ওঠে মস্ত হাই।

আজ কিন্তু তেমন কিছু হল না। আর কী আশ্চর্য! ডাকতেও হয়নি ওকে। বরং ও সবাইকে ধাক্কা দিয়ে তুলে বাড়ি মাথায় করেছে।

আকাশ থেকে অন্ধকার খুব মিহিভাবে সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে জড়ানো সাদা মেঘ। ভোরের আলোয় সিল্কের মতো দেখাচ্ছে।

গাড়ি গতকালই রেডি করে রাখা হয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত খাবারদাবারও বানানো হয়েছে। এখন বড়-বড় টিফিন কেরিয়ারে ওই সব খাবার ভর্তি করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

পিকুর আর তর সইছিল না। ছোটাছুটি, লাফালাফি করে সারা বাড়িতে হৈ-চৈ ফেলে দিল।

সকালের প্রকৃতি বেশ ঠাণ্ডা। হাওয়া বইছে। লনের টবে ফুলগাছ। হাওয়ায় দুলছে। ইউক্যালিপটাসের পাতা ভোঁ-কাটা হয়ে বাতাসে ভাসতে থাকে।

পিকুর অত কিছু দেখার সময় নেই। সে সবার আগে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে। হর্ন বাজায় একনাগাড়ে। হর্ন বাজালে সবাই ঝটপট এসে পড়বে পিকু জানে।

সাতটা বাজার আগেই গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। সোজা সড়ক ছেড়ে ঘোরানো পথে। ঘন সবুজ কার্পেট বিছানো পাহাড়তলি কাছে সরে আসে। পিকু মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে সব দেখতে থাকে।

চৌপট্টিতে এসে গাড়ি থেমে গেল। পিকু অবাক হয়ে দেখে, ওদের মতো আরো কত গাড়ি ওখানে থেমে রয়েছে। কোনোটার রঙ কালো, কোনোটা লাল টুকটুকে। নীল, বেগুনি, ছাই—কত রঙের বাহারি গাড়ি। পিকু দেখে আর অবাক হয়। সবগুলোই দেখতে সুন্দর।

পিকু একছুটে গাড়িগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাল করে দেখে কোন্ গাড়িটা সব চাইতে সুন্দর। একবার ভাবে ডানা-মেলা ময়ূরপঙ্খিটার কথা। আবার ভাবে ছাদ-খোলা গাড়িটাই সব থেকে ভাল। গাড়িতে বসে কেমন আকাশ দেখা যায়।

পিকু এবার নিজেদের গাড়িতে না উঠে ঘোষকাকুর লাল গাড়িটায় গিয়ে বসল। ঘোষকাকু শিলংয়ের খুব বড় ডাক্তার, সঙ্গে আছেন কাকিমা। আর দুই ছেলে। বিলু ও মণ্টু। পিকুকে ছাড়া ওরা থাকতে পারে না। পিকুও ওদের দুজনকে খুব ভালবাসে।

মার্চ মাস হলেও শিলংয়ে বেশ শীত। ভোরের হিমেল বাতাস পিকুর চোখে-মুখে এসে লাগে। মাথার চুল হাওয়ার টানে এলোমেলো হয়ে যায়।

দূরে পাহাড়ের মালা থাকে-থাকে সাজানো। হালকা নীল, ধূসর, ছাইরঙা পাহাড়। রঙ-তুলি দিয়ে যেন কেউ এঁকে রেখেছে।

আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলদে রোদ উঠল। এঁকে-বেঁকে

টারজানের ছবি বিদেশ থেকে আসে। কিছুদিন যাবৎ আসছে না বলে এ-সংখ্যায় টারজান ছাপা হল না। নতুন ছবি এলেই আবার টারজানের দেখা মিলবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বিদেশে। ফলে 'কালো পর্দার ওদিকে'ও এ-সংখ্যায় নেই। আশা করছি, সামনের সংখ্যা থেকেই এই ধারাবাহিক উপন্যাস তোমরা আবার নিয়মিত ভাবে পাবে। একটু ধৈর্য ধরো, কেমন?

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

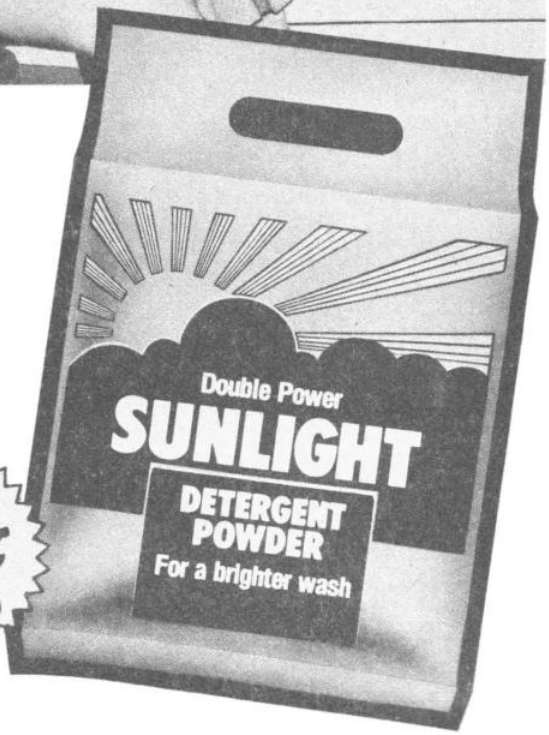

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সাপের মতো ওদের গাড়ি এগিয়ে চলে। পিকু দেখতে থাকে নানা রঙের মরসুমি ফুল। যেন পাহাড়ের গায়ে নকশা-কাটা শাড়ির পাড় বসিয়ে রাখা হয়েছে।

শিলং থেকে বেশ খানিকটা দূরে নওক্রেমে যাচ্ছে ওরা পাহাড়ি লোকদের উৎসব দেখতে। ওদের আজ বসন্ত-উৎসব। মেয়েরা দল বেঁধে নাচবে। ছেলেরা মাদল বাজাবে। গান গাইবে। মাথায় পালক গুঁজে আবার নাচবেও। ওদের মতো শিলংয়ের অনেকেই যাচ্ছে বসন্ত-উৎসব দেখতে।

নওক্রেমে পৌঁছে সব গাড়ি আবার সার বেঁধে দাঁড়াল। শতরঞ্চি পেতে খাবারদাবার নামিয়ে সবাই বসল। টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিল কেউ। গান-বাজনা খেলাধুলায় নওক্রেম কিছুক্ষণের মধ্যে মেলার মতো জমজমাট হয়ে উঠল।

পিকু ওর দুই বন্ধু বিলু আর মণ্টুকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনের পাহাড়টার কাছে চলে গেল। ছোট্ট-ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েরা পাহাড়ি ফুল তুলছে সন্ধেবেলার উৎসবের জন্য। ছোট্ট-ছোট্ট চোখ, চ্যাপ্টা নাক ওদের। মোমের মতো মুখ।

খাসিয়া মেয়েগুলো ওদের দেখে একটুও ভয় পেল না। পিণ্টু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি কোথায় তোমাদের?"

"ওই দিকে," বলে মেয়েটি আঙুল উঁচিয়ে দূরের গ্রাম দেখায়।

পিকু এবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম লুঙ।"

ওরা বেশি কথা বলে না। শুধু একমনে ফুল তুলে যায়। ছোট-ছোট মুঠিতে ফুলের গোছা ধরে রাখে। তারপর বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

লুঙ কিন্তু গেল না। ও আরও ফুল তুলবে। আরও বড় তোড়া বানাবে। একটা উঁচু ডালে একথোকা রডোডেনড্রন। লুঙ ওটা নেবে। লাফ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু নাগাল পেল না।

পিকু ওর থেকে লম্বা। তাই লাফ দিয়ে ডালটা ধরে ফেলল। লুঙকে থোকাটা দিতে ওর মুখ হাসিতে ভরে গেল। এমনিতে ছোট চোখ, হাসিতে তাও বুজে গেল।

পিকু পকেট থেকে কয়েকটা চকোলেট বের করে বিলু আর মণ্টুকে দিল। নিজেও খেল। আর একটা লুঙের মুখে পুরে দিল। লুঙ কোনোদিন চকোলেট খায়নি। ও খায় আর অবাক চোখে পিকুর দিকে তাকায়। আনন্দে ওর চোখ আবার বুজে যায়।

অনেক কষ্টে তৈরি করা বড় ফুলের তোড়াটা পিকুর হাতে দিয়ে ও বলে, "তুমি খুব ভাল।"

পিকু ফুলের তোড়াটা পেয়ে খুব খুশি। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তোড়াটার ফুল দেখল। বিলু আর মণ্টুও আহ্লাদে আটখানা। বনের রাজার ফুলের তোড়া পিকু পেয়ে যাওয়ায় ওরা বলল—পিকুই বনের রাজা। লুঙও ওদের কথায় আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। এবার কিন্তু ওর চোখ বুজল না।

ছবি : দেবাশিস-দেব

শিশুর প্রশ্ন

প্রভাতকুমার দত্ত

সারাদিনের কাজের শেষে
দিনের সুয্যি ডোবে,
রাত্তিরে মা সুয্যিমামা
কার বিছানায় শোবে?
চাঁদমামাটা দুষ্টু ভীষণ,
ছোট্ট হতে হতে,
হঠাৎ কেন ডুব দিয়ে দেয়
আঁধার-নদীর স্রোতে?
ব্যাপার দেখে বলব কী মা,
গা যেন যায় জ্বলে,
ভাবি, শেকল দিয়ে বাঁধি,
যাতে না যায় চলে।
মামার বাড়ি মামারা সব
এক বাড়িতেই থাকে,
চাঁদমামাটা ভয় পায় কি
সুয্যিমামাটাকে?
দাও না ছেড়ে, আসি ঘুরে
চাঁদমামাদের দেশে,
ছাদে বসে বলবে কথা
সারাদিনের শেষে।
তোমার জন্য আনব শাড়ি
বাবার জন্য জুতো,
আমার জন্য আনব লাটাই,
মাঞ্জা-দেওয়া সুতো।

ছবি : অনুপ রায়

টিনটিন

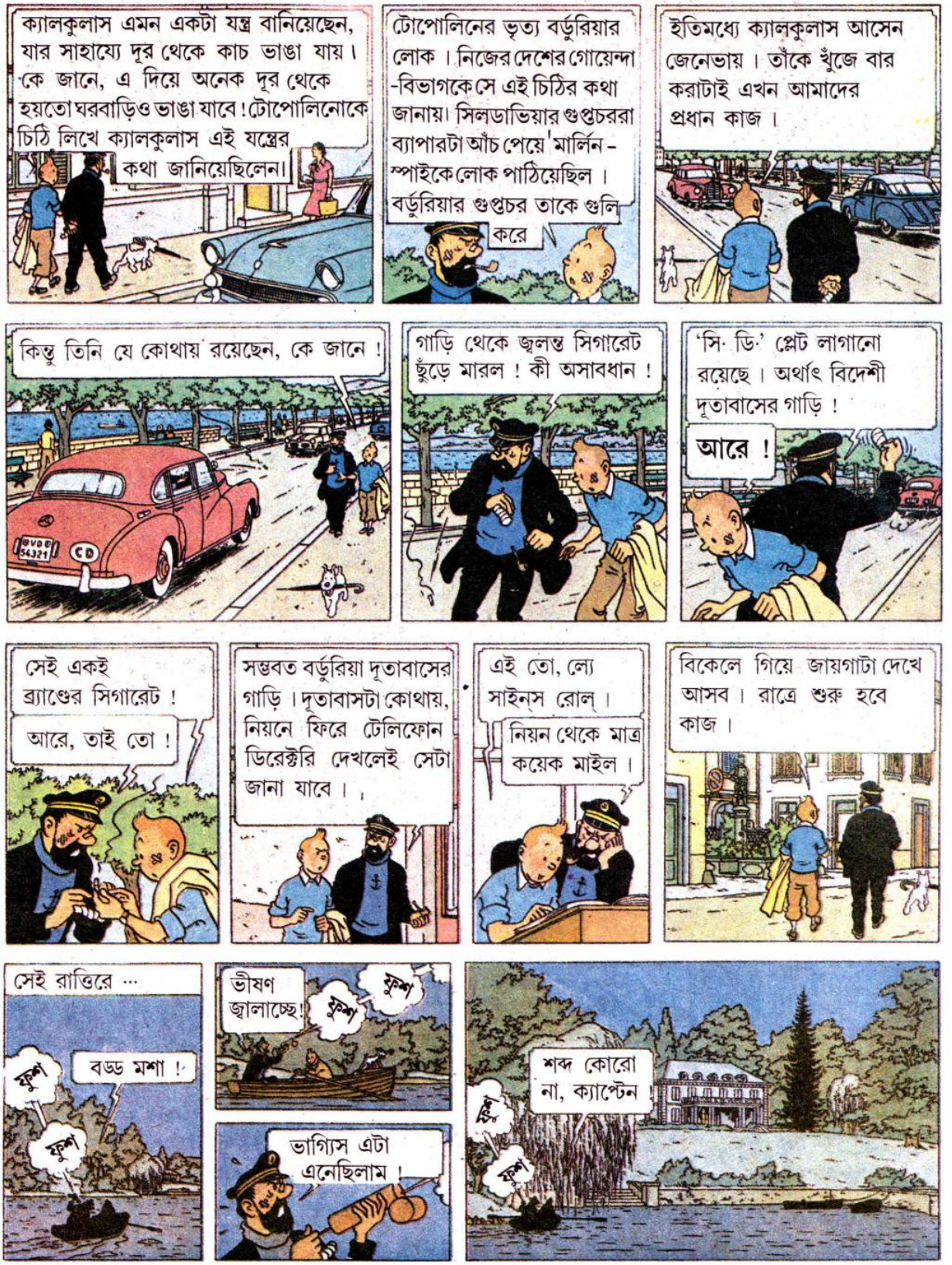
ক্যালকুলাস এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছেন, যার সাহায্যে দূর থেকে কাচ ভাঙা যায়। কে জানে, এ দিয়ে অনেক দূর থেকে হয়তো ঘরবাড়িও ভাঙা যাবে! টোপোলিনোকে চিঠি লিখে ক্যালকুলাস এই যন্ত্রের কথা জানিয়েছিলেন।
টোপোলিনের ভৃত্য বর্ডুরিয়ার লোক। নিজের দেশের গোয়েন্দা-বিভাগকে সে এই চিঠির কথা জানায়। সিলডাভিয়ার গুপ্তচররা ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে মার্লিন-স্পাইকে লোক পাঠিয়েছিল। বর্ডুরিয়ার গুপ্তচর তাকে গুলি করে
ইতিমধ্যে ক্যালকুলাস আসেন জেনেভায়। তাঁকে খুঁজে বার করাটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।
কিন্তু তিনি যে কোথায় রয়েছেন, কে জানে!
গাড়ি থেকে জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারল! কী অসাবধান!
'সি· ডি·' প্লেট লাগানো রয়েছে। অর্থাৎ বিদেশী দূতাবাসের গাড়ি!
আরে!
সেই একই ব্র্যাণ্ডের সিগারেট!
আরে, তাই তো!
সম্ভবত বর্ডুরিয়া দূতাবাসের গাড়ি। দূতাবাসটা কোথায়, নিয়নে ফিরে টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখলেই সেটা জানা যাবে।
এই তো, ল্যে সাইন্স রোল্।
নিয়ন থেকে মাত্র কয়েক মাইল।
বিকেলে গিয়ে জায়গাটা দেখে আসব। রাত্রে শুরু হবে কাজ।
সেই রাত্তিরে ···
বড্ড মশা!
ফুশ
ফুশ
ভীষণ জ্বালাচ্ছে!
ফুশ
ফুশ
ভাগ্যিস এটা এনেছিলাম!
শব্দ কোরো না, ক্যাপ্টেন!
ফুশ
ফুশ

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

বিস্তর জুনিয়ার খেলোয়াড় নিয়েগড়া রোভার্স ০–১ গোলে হেকলাভিকের কাছে হারছে। খেলা শেষ হতে আর বিশেষ বাকি নেই ···
লেন পিটার্স বল বাড়িয়েছে !
দেখা যাক কী হয় !
মারো ব্ল্যাকি !

ব্ল্যাকির শট একজন ডিফেণ্ডারের গায়ে লেগে ···
ক্রস-বারে ঠেকে ফিরছে !
রয় ঠিক গোল করবে !

কিন্তু রয়কে অন্যায়ভাবে আটকানো হল ···
এ কী !
ফাউল ! পেনালটি !

রেফারি পেনালটি দিলে হয় !
ROVERS
ও তো খেলাশেষের বাঁশি বাজাল !
খেল খতম !

রয় তাহলে বল বসাচ্ছে কেন ?
পেনালটি দেওয়া উচিত। কেননা ···
সময় শেষ হবার ঠিক আগেই ফাউল হয়েছিল।

এ-শট আমিই নেব !
মারো রয় !

গোল দাও!
এটাই শেষ সুযোগ !
গোল না-হলে লজ্জার কথা হবে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও
সেখানে

লাইফবয়—স্বাস্থ্যেরই নাম। সারাদিন ধরে খাটুনীর পরে ... কিম্বা প্রচণ্ড হুটোপাটি করে খেলার মজার পরে, লাইফবয় দিয়ে স্নানের মজাই আলাদা! এ আবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে—এক সাফ আর সুস্থ অনুভূতি!

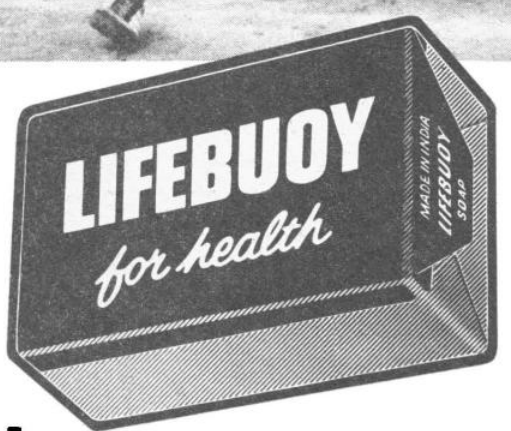

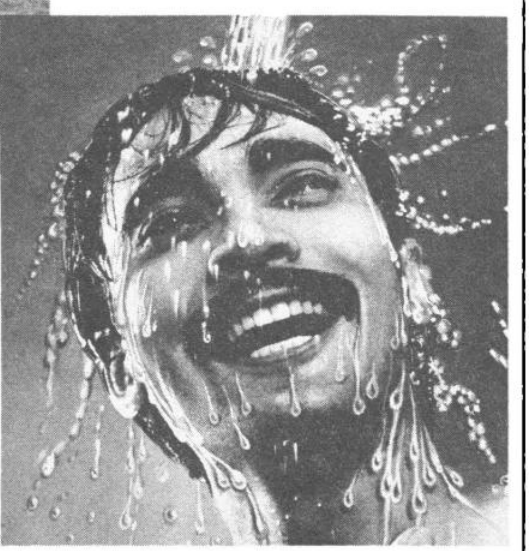

লাইফবয় ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS L 88 2116 BG

ইলামবাজারের বনে

অজেয় রায়

সাঁওতালপাড়া থেকে কাজ সেরে যখন বেরোল দুলাল তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। আকাশের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকায় সে। মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে নাকি ? এতটা দেরি হয়ে যাবে ভাবেনি। এখান থেকে পিচরাস্তা প্রায় মাইলখানেক। জঙ্গলের কাঁকুরে পথ এবড়োখেবড়ো। দেখেশুনে ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে দুলাল বড় রাস্তার দিকে চলল।

ইলামবাজারের বনে ঢুকেছিল দুলাল। এসেছিল ব্যবসার কাজে। বোলপুর-ইলামবাজার রোড গেছে এই জঙ্গল ভেদ করে। এখানে জঙ্গলের বিস্তার প্রায় দু' মাইল। ইলামবাজার রোড থেকে কিছু সরু সরু মেঠো পথ ঢুকে গেছে বনের গভীরে। বনের মধ্যে কয়েকটা গ্রাম আছে। সাঁওতালি গ্রামই বেশি। ওই সব পথ ধরে গ্রামগুলোয় পৌঁছানো যায়।

দুলালের বাস ইলামবাজার শহরে। ছোট গঞ্জ-শহর। একটা মুদির দোকান আছে দুলালের। শালপাতা দরকার। শিগগিরই বেশ কিছু। দু'দুটো শ্রাদ্ধের ভোজে যোগান দিতে হবে। ইলামবাজারের বন প্রধানত শালের জঙ্গল। বনের সাঁওতালরা শালপাতা বিক্রি করে। তাদেরই একজনকে পাতার অর্ডার দিতে এসেছিল।

দুলাল এসেছিল বিকেল তিনটে নাগাদ। বুধন মাঝি বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরল ছ'টা বাজিয়ে। তারপর কথাবার্তা দরদস্তুর। বুধনের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করার জো নেই। এক কথার কাজ সাত কথায় টানবে।

দিনের আলো কমে আসছে। সঙ্গে টর্চ নেই। দুলাল ভাবে তাতে কী ? একবার পাকা রাস্তায় উঠতে পারলেই নিশ্চিন্তি। ও পথ তার মুখস্থ। হুহু করে প্যাডেল মারব। বাকি জঙ্গল আরও মাইলখানেক। তারপর আর এক মাইল ইলামবাজার পৌঁছতে। এর চেয়ে ঢের দেরিতে সে কতবার একা রাতে জঙ্গল পেরিয়েছে। তিরিশ বছরের জোয়ান তার ভয়ডর কমই। শুধু জল না এলেই বাঁচি। বাদলা সন্ধ্যায় ভেজা ভারী বিশ্রী ব্যাপার।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ইলামবাজার রোডের কাছাকাছি আসতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

সাইকেল থেকে নেমে দুলাল এদিক-সেদিক তাকায়। বাঁ পাশে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। পথ থেকে শতখানেক হাত তফাতে। আর তো কোনও আশ্রয় নজরে পড়ছে না। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে দুলাল ছুটল মন্দির লক্ষ করে।

ছোট্ট মন্দির। কেবল একটি ঘর। উঁচু ভিত। দরজাটা বন্ধ। দরজার সামনে রোয়াকের ওপর তিন-চার ফুট মাত্র ঢাকা ছাদ। সাইকেল মন্দিরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দুলাল সিঁড়ি দিয়ে রোয়াকে উঠল।

এই পথে যেতে-আসতে মন্দিরটা তার চোখে পড়েছে। যদিও ভিতরে দেখেনি কখনো। এটা মনসা দেবীর মন্দির। ছিরিছাঁদ নেই, নেহাত সাদামাটা। তবে খুব পুরনো। পাশেই প্রকাণ্ড এক ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ।

মন্দিরটা গ্রাম থেকে বেশ দূরে। দুলাল শুনেছে, এই মন্দিরের পিছনে নাকি কয়েক ঘর সাপুড়ে থাকত। তারাই এই বিগ্রহের পূজারী। বছর পঁচিশ আগে গুটিবসন্তের মড়কে তাদের সবাই প্রায় উজাড় হয়ে যায়। যারা প্রাণে বাঁচে এখানকার বাস ছেড়ে বনের ভিতরে কাছের গ্রামটায় নতুন করে ঘর বাঁধে। তাদের ছেড়ে যাওয়া ভিটেগুলি এখন জংলা ঢিবি হয়ে গেছে।

খোলা বারান্দায় শুধু ওপরের ছাদটুকু ছাটের হাত থেকে বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মাথা বাঁচলেও জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে। ওই তেঁতুলগাছটার নীচে যাই। ঘন পাতায় হয়তো জল আটকাবে। দুলাল দৌড়ে গেল গাছটার তলায়। দাঁড়াল গুঁড়ির গা ঘেঁষে। সত্যি এখানটায় ঢের বেশি আরাম। উঃ, জায়গা কী ভীষণ নির্জন। গা ছমছম করে।

যাক বাঁচোয়া, মিনিট-পনেরো বাদেই বৃষ্টি ধরে এল। ক্রমে

টিপিটিপি ধারা। এখুনি একদম থেমে যাবে। তখন বেরোব। হঠাৎ দুলাল দেখল মন্দিরের যেদিকে তেঁতুলগাছ তার উল্টো দিকের বনের ভিতরে একটা আলো মাঝে-মাঝে জ্বলেই নিভছে। এগিয়ে আসছে এদিকে। টর্চের আলো বলে মনে হচ্ছে। কেউ আসছে বনের শুঁড়িপথ দিয়ে। কে ?

ফরেস্ট গার্ড কি ? আর একটা সম্ভাবনা দুলালের মনে জাগে। আজকাল ইলামবাজার রোডের ওপর জঙ্গল-এলাকায় মাঝে-মাঝে ডাকাতি হচ্ছে।। ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে বনে। সন্ধ্যা বা রাতে এই পথে চলা গাড়ি আটকে লুটপাট করে। তেমনি কোনও দুষ্টলোক নাকি ? গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দুলাল লক্ষ রাখে।

লোকটি দ্রুত পায়ে এসে থামল মন্দিরের সামনে। তার ডান হাতে একটা মোটা লাঠি, অন্য হাতে টর্চ। কাঁধে একটা ঝোলা। থমকে দাঁড়িয়ে সে একবার তাকাল চারধারে। দুলাল বা তার সাইকেল লোকটির নজরে পড়ল না। এর পর সে উঠে গেল মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে। দরজা খোলার আওয়াজ। তারপর লোকটা টর্চ জ্বেলে ভিতরে ঢুকল।

দুলালের মনে দারুণ কৌতূহল। কী করছে ও ? সে নিঃশব্দে একটু এগিয়ে মন্দিরের সামনাসামনি একটা শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয়।

টর্চের জোরালো আলো পড়েছে বেদীর ওপর দেবীমূর্তির গায়ে। চকচক করছে কালো পাথরে তৈরি বিগ্রহ। লোকটার চেহারাটাও দেখা গেল খানিক। আগন্তুক লাঠিটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে ধরল দেবীমূর্তিটি। দুলাল চমকে দেখল হঠাৎ মূর্তির পাশ থেকে মস্ত ফণা মেলে হাত-দেড়েক খাড়া হয়ে উঠল কুচকুচে কালো এক প্রকাণ্ড সাপ। বিদ্যুৎবেগে সাপটা আছড়ে পড়ল সামনে। চাপা আর্তনাদ করে লোকটা ছিটকে সরে এল। পরক্ষণেই সে লাঠিটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড এক ঘা বসাল সাপটার মাথায়।

মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকটা। দুলাল যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল। বাঁ হাত দিয়ে রুমালটা জড়াল তার ডান হাতের কনুইয়ের একটু ওপরে। রুমালের একপ্রান্ত বাঁ হাতে ধরে অন্য ধার দাঁতে কামড়ে সজোরে টেনে গিঁট দিল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইয়ের কাছে শক্ত করে চেপে ধরে ছুটে চলে গেল বনের মধ্যে। যে পথ দিয়ে সে এসেছিল সেই পথে। তার ডানহাতে ধরা রয়েছে জ্বলন্ত টর্চ।

দুলাল বুঝল যে, লোকটা সাপের ছোবল খেয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে এল, মাত্র হাত-কুড়ি দূরে সেই আহত হিংস্র বিষধর। দুলাল দৌড় মারল। এক ছুটে গিয়ে হাজির হল মেঠো রাস্তায়।

জনপ্রাণীর দেখা নেই। বৃষ্টি থেমেছে বটে তবে জোলো হাওয়া বইছে। আকাশ মেঘলা। দিনের আলো একেবারে আবছা। শঙ্কিত উদ্‌ভ্রান্ত দুলাল পথের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো বারবার দেখে। উদ্বিগ্ন চোখে লক্ষ রাখে মন্দিরের দিকে।

এই পথ ধরে বনের ভিতরে আধমাইলটাক গেলে একটা গ্রাম আছে। হিন্দু চাষি গ্রাম। সেই গ্রামে গিয়ে লোকজন ডেকে আনব নাকি ? সাইকেল ফেলে বেশি দূর যেতে দুলালের ভরসা হয় না। আবার মন্দিরের গা থেকে সাইকেল নিয়ে আসার সাহসও তার নেই। দোটানায় পড়ে ভেবে পায় না কী করবে ? একটা আলো এবং একটা মোটা লাঠি যদি মিলত। সাইকেলটা নিয়ে আসা যেত। হোক অন্ধকার, এই মেঠো পথটুকু সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে একবার মেন রোডে পড়লেই ঠিক ফিরে যেতাম ইলামবাজার।

মিনিট-দশেক অপেক্ষা করে নিরুপায় দুলাল যেই গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছে তখনি দেখল দূরে একটা আলো। ইলামবাজার রোডের দিক থেকে এগিয়ে আসছে টর্চ। আরও কাছে আসতে বোঝে দু'জন সাইকেলে আসছে। সামনের লোকটির হাতে টর্চ জ্বলছে।

সাইকেল-আরোহীরাও দেখেছিল দুলালকে। তাদের গতি খুব ধীর হয়। দুলালের মুখে আলো পড়ে।

"আরে দুলালদা যে ! এখানে ?"

সামনের জন সাইকেল থেকে নামে। দেখাদেখি অন্য লোকটিও।

দুলাল চিনতে পারে—শিবপদ। তার দোকানে জিনিসপত্র কেনে। আলাপ হয়েছে কিঞ্চিৎ। চাষি মানুষ। সে বলল, "শিবপদ তুমি !"

"আমার বাড়ি ওই গ্রামে", শিবপদ সামনে দেখায়, "এখানে কী করছেন একা একা ?"

"সাঁওতালপাড়ায় এসেছিলাম একটা কাজে। জলে আটকে পড়লাম। একটা কাণ্ড হয়েছে, জানো—" দুলাল উত্তেজিতভাবে বলে যায় সমস্ত ঘটনা।

দুলালের কথা শেষ হতে শিবপদ ও তার সঙ্গী একবার চোখাচোখি করে। তারপর শিবপদ রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে, "আপনি দেখেছেন লোকটাকে ? মানে চেহারাটা ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বেঁটেমতন। খুব ষণ্ডা। হাতাওলা নীল রঙের গেঞ্জি আর ফুলপ্যান্ট পরেছিল।"

শিবপদ তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলল, "হুঁ, ফকির, মিলে যাচ্ছে। নসুকাকা, পুলিশ তাহলে ঠিকই ধরেছে।"

"কে ফকির ?" দুলাল জিজ্ঞেস করে।

"ওই লোকটা। যে মূর্তি চুরি করতে এসেছিল।"

"কিন্তু পুলিশ এর মধ্যে জানল কী করে ? এইমাত্র গেল যে লোকটা। এখনও পুলিশ আসেনি তো কই ?"

শিবপদর সঙ্গী বয়স্ক লোকটি এবার কথা বলল, "দুলালবাবু, ফকির আজ চুরি করতে আসেনি। এসেছিল দু'বছর আগে ঠিক এই দিনে এমনি এক বর্ষার সন্ধ্যায়। পরদিন সকালে পুরোহিত এসে দেখে মন্দিরের দোর খোলা। বিগ্রহ খানিক টেরচা হয়ে রয়েছে। ঘরের মেঝেতে পড়ে একটা লাঠি আর বিরাট এক কেলেসাপ। সাপের মাথাটা ভেঙে চুর হয়ে গেছে। তখনো প্রাণ ছিল সাপটার। সাপুড়েরা চেষ্টা করেছিল, বাঁচাতে পারেনি। আর সেই রাতে একজন লোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বন পেরিয়ে ইলামবাজারের কাছে ফাঁকা রাস্তার ধারে। ওই ফকির। সাপে-কাটা কেস। পাশে পড়েছিল তার সাইকেল। এক ট্রাক-ড্রাইভার দেখতে পেয়ে থানায় খবর দিয়ে যায়। পুলিশ সন্দেহ করে ফকিরই চুরি করতে গিয়েছিল দেবীমূর্তিটি। লোকটার বাড়ি ইলামবাজারের কাছে, গ্রামে। কুসঙ্গে পড়ে বদ হয়ে গিয়েছিল। এমনি প্রাচীন মূর্তি নাকি চড়া দামে বিক্রি হয় বিদেশে। লুকিয়ে চালান হয়ে যায়।"

"কিন্তু আমি যে দেখলাম !" দুলাল আমতা-আমতা করে।

শিবপদ পথ থেকে নেমে একটু গিয়ে টর্চ ফেলল মন্দির লক্ষ করে। তেঁতুলতলার জমাট আঁধার চিরে আলো পড়ল মন্দিরের গায়ে। শিবপদ বলল, "ওই দেখুন মন্দিরের দরজা বন্ধ।"

দুলাল থ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

"চলুন আপনার সাইকেলটা নিয়ে আসি," বলল শিবপদ। টর্চ জ্বেলে শিবপদ দুলালকে আগে আগে পথ দেখায়। সাইকেল-সমেত রাস্তায় ফিরে এসে শিবপদ বলল, "অন্ধকার হয়ে গেছে। সাথে আপনার টর্চ নেই। ফের যদি বৃষ্টি নামে ? দুলালদা, আজ রাতটা বরং আমার বাসায় থেকে যান।"

নাঃ, চলে যাই, বাড়িতে ভাববে। —কথাগুলো বলতে গিয়ে দুলালের মনে হল, পথে যদি ফকিরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ? হয়তো এখন ও মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। দুলাল শিউরে উঠল। মৃদু স্বরে বলল শুধু, "হ্যাঁ, তাই থাকতে হবে দেখছি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্রাউনিঙের বঙ্গভূমি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

জায়গাটি অদ্ভুত, চারদিকে ফাঁকা মাঠ এবং দূরে ট্রেনের লাইন। আলো বলতে চাঁদের আলো। তবে পূর্ণিমা নয়। সিগারেট শেষ করে রজনীবাবু হাতঘড়ি দেখলেন। সময় হয়ে গেছে। এবার উনি পরিত্যক্ত বাড়িটার ভিতর ঢুকে পড়লেন। গেটের দুপাশে বাঁধানো রক। ডানদিকের রকের পাশে একটা আতাগাছ। সেই রকে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। এটি তাঁর চতুর্থ সিগারেট। চাঁদের সামান্য আলোয় বাড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। এটাকে কি পোড়োবাড়ি বলা যায় ? রজনীবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবার বাড়িটির স্বরূপ ফুটে উঠল। হায়। রজনীবাবু কি তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মনুষ্যদৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সেটুকুই সব নয়। তবু তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বহুকাল আগে এই বাড়িটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ হয়নি। দরজা-জানালায় কপাট নেই। তিনি বুঝলেন এটি কালের নিষ্ঠুরতা নয়। কপাট লাগানোই হয়নি। এমন সময় দূরাগত শব্দে তিনি উৎকর্ণ হলেন। গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দেখলেন হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা মোটরগাড়ি আসছে। রজনীবাবুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে নাড়াতে লাগলেন।

গাড়িটা রজনীবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। রজনীবাবু বালকের মতন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "ব্রাউনিং, আমি এসেছি।"

ব্রাউনিং হাসলেন। গাড়ি থেকে নেমে এবার বাড়িটার দিকে তাকালেন। ব্রাউনিঙের পায়ে চটি। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছেন।

রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এই বাড়িটার কথাই বলেছিলে তো ?"

ব্রাউনিং মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, এই বাড়ি।"

স্কুলে রজনীবাবুর সহপাঠী ছিলেন বরেন্দ্র। বরেন্দ্র লেখাপড়ায় ভাল। উঁচু ক্লাসে উঠে তাঁকে কবিতার রোগে ধরে। তবে বরেন্দ্র ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। তাই বন্ধুরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন ব্রাউনিং। সেসব কতকাল আগের কথা। কতকাল আগেই তো তিনি খবর পেয়েছিলেন বন্ধুবর কালাপানি পেরিয়ে আসল ব্রাউনিঙের দেশে গিয়েছে। তারপর বহুকাল ব্রাউনিঙের কোনো খবর নেই। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রেড রোডের মুখে এসে ট্রামটা বিগড়ে গেল। রাত এগারোটা। রজনীবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। অত রাতে বাড়ি ফেরার পিছনে যে কারণটি ছিল সেই একই কারণে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ব্রাউনিঙের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সেদিন ট্রামে যাত্রী বলতে দুজন। রজনীবাবুর মুখোমুখি অন্য যাত্রীটি বসে ছিলেন। এই লোকটিকে রজনীবাবু কোনোদিন দেখেননি ঠিকই তবু একটা কিন্তু থেকেই যায়। অচেনা ব্যক্তিটির মধ্যে কেমন যেন চেনা-চেনা ভাব। আকাশে মেঘ ছিল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ ভদ্রলোক একমুখ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে রজনী, ভাল আছিস ?"

রজনীবাবু চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক আবার হেসে বললেন, "আমায় চিনতে পারলি না ? আমি বরেন্দ্র, মানে তোদের ব্রাউনিং।" তারপর জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে ব্রাউনিং বাইরে কী যেন দেখলেন।

"গাড়ি তো বিগড়েছে। শুধু শুধু বসে থেকে কী করবি। চল হাঁটা যাক।"

রজনীবাবু ব্যাকুলভাবে বললেন, "কী করে হাঁটব। বাইরে যে বৃষ্টি।"

ব্রাউনিং মাথা দুলিয়ে বললেন, "তাই তো।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টিটা ধরে গেল। দু' বন্ধু ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। ফাঁকা রেড রোড। বিকল ট্রাম প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

"তুই কোথায় যাবি ?"

"কালীঘাটে। আর তুই ?"

ব্রাউনিং হাসলেন। বললেন, "ঠিক নেই।"

"তার মানে ?"

"তার মানে এখন আমি তোদের অতিথি।"

দু'বন্ধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় ঝড়ের মতো একটা বাস 'গড়িয়াহাট, গড়িয়াহাট' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। রজনীবাবু ছুটে গিয়ে কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কালীঘাট যাবে ?"

"যাবে, যাবে। উঠে পড়ুন।" ভিড়-বাসের মধ্যে রজনীবাবু উঠে পড়লেন। উঠে পড়েই মনে হল ব্রাউনিঙের কথা। ঐ যাহ্, ভুল হয়ে গেল। অন্যায় হল। ব্রাউনিংকে রাস্তায় ফেলে এলুম !

বাড়ি ফিরে প্রায় কিছুই খেলেন না। হরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ কী বাবু। খেলেন না যে ?" রজনীবাবু জবাব দিলেন না। তিনি ব্রাউনিঙের কথা ভাবছিলেন। কতকাল বাদে ব্রাউনিঙের সঙ্গে দেখা হল। অথচ কোনো কথা হল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই কিছুদিন হল তাঁর মন ভাল নেই। অনেক দিন হল তিনি একটা লাইনও লিখতে পারছেন না। সন্ধেবেলায় বেরিয়ে পড়েন। গোরস্থানে কিংবা শ্মশানঘাটে অথবা কোনো পোড়োবাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ান। ডোমেদের সঙ্গে ভাব করে গল্পগুজব করেন। ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো গেজেট হাতড়ে হানাবাড়ির খোঁজ করেন। কলকাতায় যদি কোনো একশো বছরের মানুষ থাকেন তার সন্ধান করেন। শ্মশানঘাটের স্টুডিয়োর কাছে দাঁড়িয়ে মৃত মানুষের মুখ লক্ষ করেন। এসবের একটাই উদ্দেশ্য। গল্পের সূত্র খোঁজা। রজনীবাবু ভূতের গল্প লেখেন। সেদিনও নিমতলা শ্মশানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে গঙ্গার ধারে হেঁটেছেন। তাই অত রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। রেড রোডে ট্রাম বিগড়ে গেল। ব্রাউনিঙের সঙ্গে দেখা হল। এইসব কারণে মন ভার ছিল। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। এই সময় ফোন বেজে উঠল, রজনীবাবু রিসিভার তুলেই শুনতে পেলেন, "কে—রজনী ? আমি ব্রাউনিং।"

রজনীবাবু আনন্দে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। ব্রাউনিং অবশ্য তাঁকে কথা বলতে দিলেন না।

"তোর কষ্টটা কী আমি লাঘব করে দিতে পারি না ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে তোকে একটা গল্পের প্লট দেব।"

"কিন্তু ব্রাউনিং, আমি তো এক বিশেষ ধরনের গল্প লিখি।"

"জানি জানি, ভূতের গল্প তো !"

সেই জন্যে ব্রাউনিঙের কথামতো রজনীবাবু আজ ভদ্রেশ্বরের এই বাড়িটায় এসেছেন। রজনীবাবুকে নিয়ে ব্রাউনিং বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। প্রথম ঘরটিতে ঢুকে হাত

অমর চিত্র কথা

ভারতের ইতিহাস, পুরান আর লোককথার প্রাণস্পর্শী চিত্র-কাহিনী!

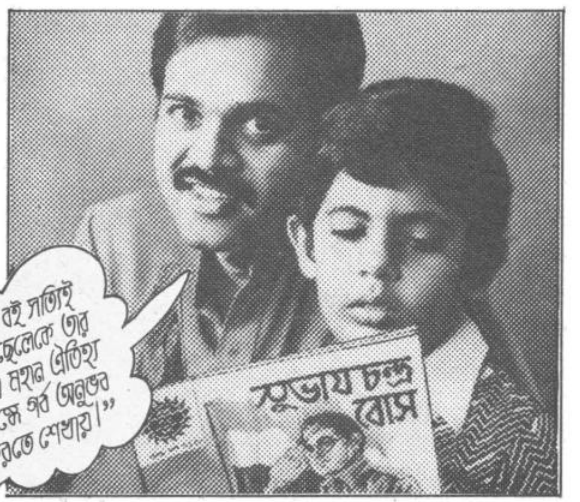

অমর চিত্র কথা ! প্রত্যেক বাচ্চার জন্যে তথ্য আর মনোরঞ্জনের সম্পদে ঠাসা এক অফুরন্ত ভাণ্ডার ! রঙ আর রোমাঞ্চের ছোঁয়ায় পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে ভারতের অতীত গৌরব !

রাম আর রাবণ। কালিদাস আর কুরুক্ষেত্র। মীরাবাঈ। স্বামী বিবেকানন্দ। কি পৌরাণিক কি অলৌকিক জগত, যুদ্ধ আর বীরত্ব গাথা — সবকিছু জীবন্ত হয়ে ওঠে অমর চিত্র কথার ২৭২টি শীর্ষকে। পাওয়া যায় — ৬টি প্রাদেশিক ভাষায়, আর ইংরিজিতেও।

অমর চিত্র কথা ! হাসি আনন্দের মধ্যে দিয়ে শুধু ইতিহাস শেখাই নয়... এক মহান দেশ সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করতেও শেখা !
এমন এক যুগে, যখন আমরা পলে পলে হারাতে বসেছি আমাদের অতীতের যোগসূত্র !

অমর চিত্র কথা

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক :
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
ইণ্ডিয়া বুক হাউস এডুকেশন ট্রাস্ট, বম্বে ৪০০ ০২৬

Contour Ads-IBH-617A/82 Ben

বাড়িয়ে আলো জ্বাললেন। এটা ড্রয়িংরুম। রজনীবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এ তো পোড়োবাড়ি নয়। দিব্যি ঝকঝকে ঘর। হোক ড্রয়িংরুম। তবে পুরোপুরি স্বদেশী কেতায় সাজানো। দুই বন্ধু মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসলেন। রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার বাড়ি ?"

বন্ধুকে চিন্তিত মনে হল। উনি যেন রজনীবাবুর কথা শুনতেই পেলেন না। আপনমনে বলতে লাগলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে ভুলটা করেছিলেন আমিও ঠিক সেই একই ভুল করলুম।"

"কেন, তুই এখনো কবিতা লিখিস নাকি ?"

"বিলেতে গিয়ে বুঝতে পারলুম বঙ্গভাণ্ডারে সত্যিই বিবিধ রতন আছে। অবোধ আমি সে-সমস্তকে অবহেলা করেছিলুম। তবে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়নি এই যা রক্ষে।"

"তুই তো এখন দেশেই ফিরেছিস। বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধ রতন তো এখন তোর হাতের কাছেই।"

ব্রাউনিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "সেজন্যেই তো রজনী, বঙ্গদেশে ফিরে এলুম। সাহেবি পোশাক বর্জন করেছি। এই বাড়িটাও আমার। সাজিয়েছি একেবারে বাঙালি কায়দায়।" ব্রাউনিং আবার চেয়ারে বসলেন। দুই বন্ধু চুপ।

এবার রজনীবাবু কথা বললেন, "একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছি না। আমার তো কবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আর তোর বয়সটা দেখছি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশে থেমে আছে। ব্যাপার কী। এটা কি বিলিতি হাওয়ার গুণ ?"

ব্রাউনিং অট্টহাস্য করে উঠলেন। সেই অমানুষিক হাসি রজনীবাবুকে শিহরিত করল। তারপর ব্রাউনিং ঘর থেকে বেরোবার জন্যে পা বাড়ালেন। রজনীবাবু বন্ধুকে ডাকলেন, "ব্রাউনিং, ব্রাউনিং।"

ব্রাউনিং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তক্ষুনি ঘরের আলো নিবে গেল। রজনীবাবুও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্রাউনিং ততক্ষণে মোটরে স্টার্ট দিয়েছেন। তারপর হাত নেড়ে বললেন, "মাই নেটিভ ল্যাণ্ড, গুড নাইট।" বায়রনের কবিতার এই লাইনটি উচ্চারণ করে ব্রাউনিং গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

"ব্রাউনিং, ব্রাউনিং" বলে চিৎকার করতে করতে রজনীবাবু মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে লাগলেন। ব্রাউনিঙের পুরনো আমলের বিলিতি মোটর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকালবেলায় পাখির ডাকে রজনীবাবু চোখ মেলে চাইলেন। উন্মুক্ত মাঠের তৃণশয্যায় শুয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" তারপর ধড়মড় করে উঠে বসলেন। এ কোথায় আমি ? দূরের লাইন দিয়ে একটা গুডস ট্রেন যাচ্ছে। হাম্বা হাম্বা রবে কোথায় যেন গোরু ডাকছে। রজনীবাবু পিছন ফিরে তাকালেন। সেই বাড়ি। পায়ে পায়ে বাড়িটার দিকে এগোলেন।

বহুকাল আগে বাড়িটা তৈরি হতে হতে থেমে গেছে। এ কার বাড়ি ? আতাগাছের লাগোয়া রকটিতে বসে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করলেন। কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। জায়গাটি ভদ্রেশ্বর। সুতরাং···। রজনীবাবু হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন।

ভোরবেলায় বাগান পরিচর্যা করা তারিণী হালদারের দৈনন্দিন রুটিন। গেট খোলার শব্দে চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলেন। "কী ব্যাপার, আপনি ?"

রজনীবাবুকে উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। চুল এলোমেলো। জামা-কাপড়ে ধুলোকাদা লেগেছে।

"আপনার কাছে এলুম," বলে রজনীবাবু এগিয়ে এলেন।

"কী সৌভাগ্য। আসুন। আসুন।" বলে হালদারমশাই প্রত্যুদ্‌গমন করলেন।

ড্রয়িংরুমে বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে রজনীবাবু বললেন, "চা খাব।" হালদারমশাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এবং বাড়ির ভিতরে সেই ব্যবস্থাই করতে গেলেন।

তারিণী হালদার একজন নামজাদা প্রকাশক। কলেজ স্ট্রিটের ট্যামার লেনে তাঁর হালদার পুস্তক ভাণ্ডার সুপরিচিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি রজনীবাবুর কাছ থেকে কোনো বই পাননি। রজনীবাবু কম লেখেন। যা লেখেন তা তাঁর বাঁধা প্রকাশকই পেয়ে যান। হালদারমশায়ের অনেক দিনের সাধ রজনীবাবুর একটি বই পাওয়ার। রজনীবাবু মানেই স্বয়ং লক্ষ্মী। এখনকার ছেলেবুড়ো সকলেই রজনীবাবুর গল্প পড়তে পাগল। তাঁর বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই হুহু করে বিক্রি হয়। যাকে বলে হট কেকের মতো। কয়েক মাস আগে রজনীবাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, এবার আপনার একটা ব্যবস্থা করার কথা ভাবছি। সেই জন্যেই কি রজনীবাবু আজ এসেছেন ? হালদারমশাইয়ের তাই আজ আনন্দ আর ধরছে না।

প্লেটভর্তি মিষ্টি, ডিম-ভাজা, মাখন-রুটি ইত্যাদি কোনোটাই রজনীবাবু নিলেন না। নিলেন শুধু দুটি ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট আর চা। যদিও রজনীবাবুর পেট খিদেতে চিঁ-চিঁ করছে। হালদারমশাই রজনীবাবুকে চেনেন। তাই আর তাঁকে ঘাঁটালেন না। যদি হিতে বিপরীত হয় ?

চা শেষ করে রুমালে মুখ মুছে রজনীবাবু বললেন, "তারিণীবাবু, এখানে আপনি কতদিন আছেন ?"

"আজ্ঞে, তা প্রায় পঁচিশ বছর হবে।"

এবার রজনীবাবু সেই বাড়িটির কথা বললেন। জানতে চাইলেন বাড়িটি কার। কিন্তু গত রাতের ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না।

হালদারমশাই বললেন, "ঐ বাড়িটার পেছনে একটা হিস্ট্রি আছে। বছর পনরো-কুড়ি আগে বরেন্দ্র দত্ত নামে এক ভদ্রলোক ঐ বাড়িটি তৈরি করতে শুরু করেন। ভদ্রলোক থাকতেন ইংল্যাণ্ডে। তাঁরই নির্দেশমতো এক ঠিকাদার বাড়িটি তৈরি করছিলেন। কাজ ফরটি পার্সেন্টের মতো হয়েছিল। কিন্তু খুব স্যাড ব্যাপার, বরেন্দ্রবাবু হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে হার্টফেল করে মারা যান। এখন ঐ বাড়িটা নিয়ে মামলা-মকদ্দমা চলছে।"

রজনীবাবু উঠলেন। "আচ্ছা, আজ আসি হালদারমশাই।"

হালদারমশাই দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তারপর কাচুমাচু মুখে বললেন, "স্যার, আমার ব্যাপারটা ?"

রজনীবাবু মুখ ফিরিয়ে স্মিত হেসে বললেন, "হ্যাঁ, খুব শিগগিরই আপনি বই পাবেন।"

ছবি : অনুপ রায়

মেলার মুখোশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দক্ষিণ জার্মানির সবচেয়ে রহস্যময় এলাকার নাম কালো অরণ্য। নিসর্গ এখানে আকাশের দিকে প্রসারিত। প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার জুড়ে প্রকৃতির সঙ্গে দিগ্বলয়ের প্রতিযোগিতার এই খেলা দেখবার মতো। সর্বোচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ফেল্ডবার্গ সমতল থেকে এমন কিছু উঁচু নয়, বড়জোর ১৪৯৩ মিটার। কিন্তু স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তার উচ্চতা, আকাশকে যেন অজস্র ভঙ্গিতে নেমে আসতে বলছে। উপত্যকার পর উপত্যকা সবুজ রঙের গায়ে অন্যান্য বর্ণালি ছুপিয়ে দিয়েছে। সবুজের মধ্যে এত রঙ্গ ছিল কে জানত! কখনও ফকিরের মতো গেরুয়া, কখনও বা মানুষের মনের ইচ্ছের মতো ফিরোজা, আবার এক-এক সময় উৎকণ্ঠার মতো ফ্যাকাশে। কিংবদন্তী আছে, রোমান সৈন্যরা একবার দূর থেকে এই রঙের বিভ্রম দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। ওদের মনে হয়েছিল, কাতারে-কাতারে প্রতিপক্ষের সৈনিকেরা কালো রঙের বর্শা-বল্লম তুলে উদ্যত হয়ে আছে। আসলে ঘন সবুজ পাইন গাছগাছালি দেখেই ওরা ওরকম ঠাউরে নিয়েছিল। ওরাই নাকি 'কালো অরণ্য' নামের জন্যে দায়ী।

আমরা একদিন পায়ে হেঁটে ঐ অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিলাম। বন-বনান্তের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে এক-একবার জিরিয়ে নিয়েছি বটে। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বোধ করিনি। ফ্রাইবুর্গ শহরের কাছে এক কৃষকের সঙ্গে বন্ধুতা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ভিটে-ছাউনিতে রাত্তিরের আশ্রয় জুটেছে। এখান থেকেই ভোরের দিকে আমরা বেরিয়ে পড়তাম, রাত্রে ফিরে এসে এখানেই তাঁর সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠতাম। বন্ধুটির পড়শিরাও আমাদের সঙ্গে আড্ডায় জড়ো হতেন। তখন মনে হয়েছিল, নিসর্গ যতই সুন্দর হোক না কেন, মানুষ আরও মহান্ সুন্দর। এখানেই নব্বুই বছরের একটি মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। সাত রাজ্যের বাঁশি সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর নেশা। যখন সারা দিনের টহল সেরে ফিরে আসতাম, তিনি এক-এক দেশের বাঁশি বাজিয়ে শোনাতেন। জীবনে কখনও এভাবে অবসর-বিনোদনের সৌভাগ্য হয়নি।

একদিন আমরা এল্ত্স উপত্যকার একটি গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। কার্নিভালের সময় তখন শেষ। তবু পরের কার্নিভালের জন্য ছেলেবুড়োরা প্রস্তুতির নেশায় বুঁদ। এক-একরকম মুখোশ বানিয়ে পরখ করা হচ্ছিল। গাঁয়ের লোকজন আগেরবারের মুখোশগুলির শিল্প নিয়ে আদৌ সন্তুষ্ট

ছিলেন না। বলাবলি করছিলেন : "কার্নিভালের আসল লক্ষ্যই তো শীতবুড়িকে তাড়ানো। কিন্তু আমাদের এবারকার মুখোশগুলো দেখে শীতবুড়ি দারুণ মজা পেয়েছে। তাই তো এখানে এখনও এত শীত!"

মুখোশের সাজঘরে গিয়ে দেখলাম মুখোশ তৈরির হরেকরকম সাজ-সরঞ্জাম। খড়, পশম, শামুক, তুলি আর রঙের সে এক ঐকতান! একটি শিশুকে সেদিন কিছুতেই তার কিণ্ডারগার্টেন পাঠানো যায়নি। সে তার দাদুর কাছে বসে মুখোশ তৈরি দেখছে। এই পিতামহ গর্বিত সৌজন্যে জানালেন, "এই ছেলেটাকে আমি কার্নিভালের সং বানিয়ে ছাড়ব। তাহলেই জগতের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্য দিয়ে হাসতে হাসতে ও চলে যেতে পারবে।"

সংগ্রহশালার মুখোশগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নারী বা পুরুষ, শিশু বা বৃদ্ধ, সবাই পরতে পারে। বর্ষীয়ান এই পিতামহ যেন আবিষ্কারের আনন্দে বললেন, "এইটেই হচ্ছে মুখোশের সুবিধে। তুমি এর মধ্যে নিজের নামগোত্র লুকিয়ে রাজার মতো ঘুরে বেড়াতে পারো। কেউ বলতে পারবে না তুমি যে তুমিই! তোমাকে শনাক্ত না করতে পারলে নিষ্ঠুর মানুষ তোমাকে আক্রমণও করতে পারবে না। আর তোমার দিক থেকে এই ব্যবস্থা বিশেষ মনঃপূত, কেননা তুমি মশাল জ্বালিয়ে ছড়া-তর্জা বানিয়ে সমাজের সমালোচনা করতে পারো।"

সঙেরা এককোণে জমায়েত হয়ে পরেরবারের কার্নিভালের ছড়ার মহড়ায় মেতে উঠেছিল। এখানে সে-সব ছড়ার দুয়েকটি থেকে তর্জমা করে দিচ্ছি :

তোদের জন্যে টাটকা এই খবর—
শীতবুড়ি নাকি জব্দ হল জবর,
তার দশা দেখে দুঃখ করে কী লাভ?
বোকা লোকেরাই অযথা করে বিলাপ।
তুই হতে চাস সঙেদের সর্দার,
তবে কেন বাপ ঘুমিয়ে থাকিস আর?
চৌদিকে কত নকল আর ভড়ং,
এসব দেখলে তবেই বনবি সং,
চৌদিকে শুধু মিথ্যুক ভদ্রতা,
সঙেদেরই মুখে এখন সত্য কথা!

এই সব ছড়া বা গানে মধ্যযুগ থেকেই চারদিকের পরিবেশ সম্পর্কে সতর্কতার সুর ঠাহর করা যায়। আমরা যে-গাঁয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্ম ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বিখ্যাত তিরিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮) থেকেই এখানে প্রচুর ভাঙচুর হয়েছে। রাজারাজড়ার খেয়ালে দুর্গবুরুজের ভাঙাগড়া লক্ষ করেছে এখানকার মানুষ। তাই সমাজের উঁচু মহল সম্পর্কে এখানকার মানুষ এখনও ঘোর সন্দিগ্ধ। আর তাই তাদের গীতিরঙ্গে তার ছাপ লেগে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

একটি সঙের মুখোশ দেখে মনে হয়েছিল, দু' গালে যেন চোখের জল ভরাট রক্তবিন্দু হয়ে আছে। গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই ভুল ভেঙে গেল। ঐ দুটি রক্তরঙা চিহ্ন নাকি সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীক! "কার্নিভালের মানুষের আবার দুঃখ-দুর্দশার সময় আছে নাকি, তার একদিকে সূর্য অন্যদিকে চাঁদ," এই বলে একজন মুখোশশিল্পী আবার তাঁর আনন্দ নাট্যের রিহার্সালে মজে গেলেন।

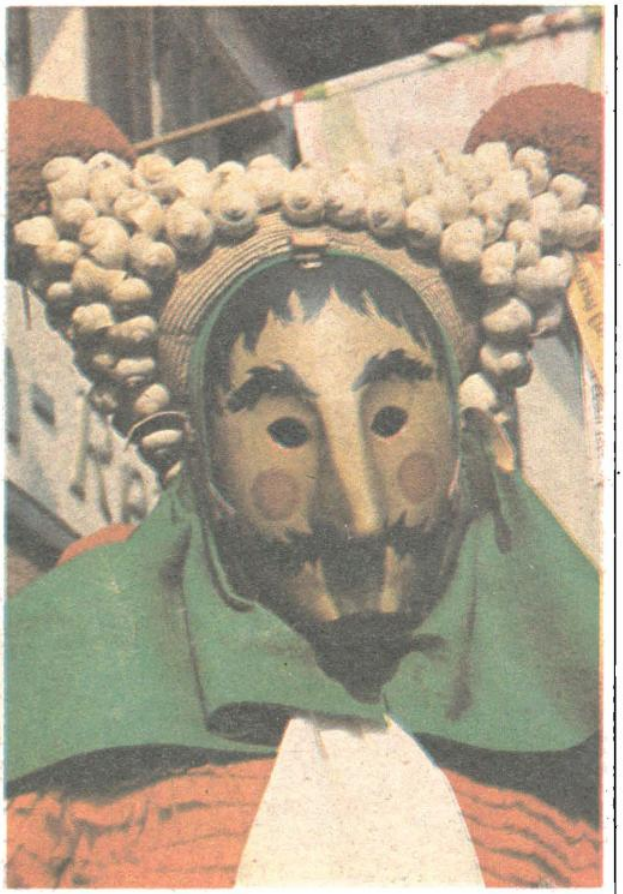

মানুষবলির জঙ্গলে

শৈলেন ঘোষ

(শেষাংশ)

জলদস্যুদের দেখে হয়তো বেহুঁশ হয়েই দাঁড়িয়ে থাকত টুহো। খুব বরাতজোর, হঠাৎ লুলামই ওর হাতটা ধরে টান দিল। ধক্ করে কেঁপে উঠেছে টুহোর বুকের ভেতরটা। হাতটা টান দিয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই লুলাম বলে উঠল, "একটা দস্যু এদিকেই আসছে!"

আর দেখতে হয়! একেবারে লুলামকে প্রায় টানতে টানতে টুহো ছুটল। ছুটতে ছুটতে বলল, "লুলাম, লুকিয়ে না পড়লে ধরা পড়ব।"

সে-সময়ে এর বেশি দুজনের মুখে আর কোনো কথাই সরল না। অবিশ্যি তখন তো কথা বলার সময় নয়, তখন পালাবার সময়। কেননা, লুলামকে আপাতত একটা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে, এখন দুজনেই আর এক ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়ে গেছে! কেউ জানে না, এখন ওরা বেঁচে যাবে কি না। যদিও-বা বাঁচে, আর তখন যদি ধরা পড়ে ওদের যে কিছুই করার থাকবে না। হয়তো ওদের দুজনকেই জাহাজে বন্দী করে লুলামের বাবা আর মা'র মতো কোনো অজানা দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে এই জলদস্যুর দল! তখন? সুতরাং এখন, ওই যে একটা দস্যু এগিয়ে আসছে, তার চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ল।

আশ্চর্য! লোকটা কিন্তু এদিকে এলই না। এমনকী, তাকে দেখে মনে হল, টুহো আর লুলাম যে এখানে লুকিয়ে বসে আছে, সেটিও সে টের পায়নি। যেমন করে সে আসছিল, তেমনি করেই সে ঝোপের ওই পাশ দিয়ে চলে গেল! কে জানে হয়তো বা টহল দিচ্ছে! কিন্তু, তাহলে টুহো আর লুলাম এখন কী করে! ওরা তো দস্যুদের প্রায় নাগালের মধ্যে। ওদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যে পালাবে, সে মিথ্যে আশা! অথচ এভাবে এখানে এই ঝোপের মধ্যে বেশিক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ-কথাটা তো ভুললে চলবে না, টুহো আর লুলামের সামনে যেমন জলদস্যুদের হিংস্র থাবা উঁচিয়ে আছে, তেমনি পেছনেও তো শত্রু এতক্ষণে তাদের খোঁজে বনের ভেতর লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিয়েছে! তাহলে কী করবে এখন টুহো আর লুলাম। সামনেও যেতে পারে না, পিছনেও ফিরতে পারে না! এখনই, এই মুহূর্তে যদি কোনো বাঁচার পথ তারা খুঁজে না-পায়, তবে

একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবেই।

এমনই সময় লুলাম ফিসফিস করে উঠল, "লোকটা তো চলে গেল।"

টুহো উত্তর দিল, "এখান থেকে বেরুলেই সামনের ওই দস্যুদল দেখতে পাবে।"

লুলাম বলল, "কিন্তু এখানে এভাবে কতক্ষণ থাকবে?"

টুহো উত্তর দিল, "কী করব ভেবে পাচ্ছি না।"

লুলাম জবাব দিল, "অন্তত, এখনকার মতো গাছের উপর উঠে তো লুকিয়ে থাকতে পারি।"

মতলবটা টুহো যেন লুফে নিল। লুলামের মুখে এই চমৎকার কথাটা শুনে টুহোর মনে হল, পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যত বুদ্ধিমান মানুষ আছে, লুলাম যেন তাদের সবার সেরা বুদ্ধিমান! অন্যসময় হলে টুহো নিশ্চয়ই আনন্দে লুলামকে কাঁধে তুলে নিত। কিন্তু এখন সে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "শাবাশ লুলাম! ঠিক বলেছিস। আয় তবে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি।"

সামনের ঝাঁকড়া গাছটা আঁকড়ে ধরে দুজনেই তরতর করে উঠে পড়ল। টুহোরা বনের মানুষ। সুতরাং গাছে ওঠা ওদের কাছে টুসকি। আর, এই গাছটাও কী বিরাট দ্যাখো। এদিক-ওদিক ডালপালা ছড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে আছে। ঝড় উঠলে যখন ঝটাপটি লাগিয়ে দেয়, তখন দেখলে মনে হবে, যেন একটা দানব! রেগে তাল ঠুকছে! পরপর এমনি যদি কয়েকটা গাছ গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তো বোঝাই দায়, কার মাথা কোন্‌টি! আর এমনই কোনো গাছের ডালে কেউ যদি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, কার সাধ্যি তাকে খুঁজে বার করে!

সুতরাং এখন টুহো আর লুলামকেও খুঁজে পেতে হচ্ছে না। এই ডালটায় পা দিয়ে, ওই ডালটায় লাফ মেরে দুটিতে একেবারে সটান মগডালে! সুবিধামতো একঝাঁক পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে রইল। এখানে অবিশ্যি ওদের কেউ দেখতে না-পেলেও, ভয় যে একেবারেই নেই তা যেন মনে কোরো না! একজনের চোখে ধুলো দেওয়া ভারী শক্ত! তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ সে কে? তার কথা কিন্তু তোমরা আগেই শুনেছ। তার নাম জাগুয়ার। বলো, কী ধূর্ত শয়তান এই জন্তুটা!

বসে থাকতে-থাকতে দুজনেই আড়ষ্ট চোখে এদিক ওদিক দেখছিল। হঠাৎ লুলাম টুহোর গায়ে আলতো হাতে ঠেলা মারল। টুহো চমকে গেছে। ফিরে তাকাতেই ইশারা করল লুলাম। যেদিকে ইশারা করল সেদিকে তাকিয়ে টুহো দেখতে পেল, গাছের এই মগডাল থেকে জলদস্যুদের আস্তানাটা স্পষ্ট

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সমস্যটা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে ঘরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

OBM/3685 BEN

তোমার দরকার হবে :

- কার্ডবোর্ড
- কার্ড-পেপার
- ভেলভেট কাগজ (হলদে, খয়েরী আর গোলাপী)
- ফেভিকল এম-আর অ্যাডহীসিভ

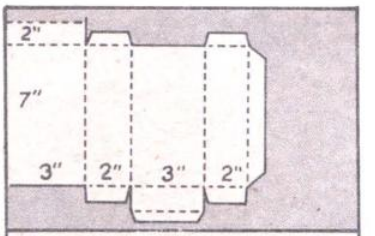

১. একটা ১৩"x১১" সাইজের কার্ডবোর্ড-শীট নাও। বাক্সের সীমা-লাইন টেনে নাও (যেমনটি দেখানো হয়েছে) আর সেই লাইন বরাবর কেটে ফেলো। বিন্দু-বিন্দু লাইন-গুলো হচ্ছে কার্ডবোর্ড ভাঁজ করার জায়গা।

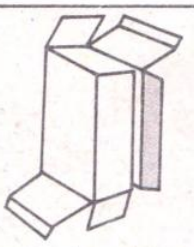

২. ঐ বিন্দু-বিন্দু লাইন অনুযায়ী কার্ডবোর্ডটি ভাঁজ ক'রে ফেলো আর ফেভিকল এম-আর দিয়ে সেঁটে বাক্স বানাও। বাক্সের তলাটি জুড়ে দিয়ে বন্ধ কর।

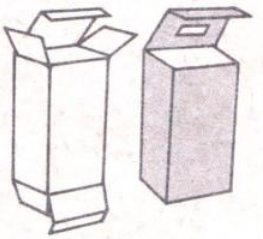

৩. নীচে ও ওপর সমেত বাক্সটিকে খয়েরী ভেলভেট কাগজ দিয়ে জড়িয়ে দাও। বাক্সের ওপরটায় একটা ফালি কর।

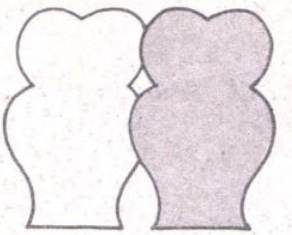

৪. এবার, কার্ড-পেপার কাটো (যে আকারের দেখানো হয়েছে) আর খয়েরী ভেলভেট কাগজ সেঁটে দাও, পেছনে-পেছনে—এই হ'ল ওলির দেহ।

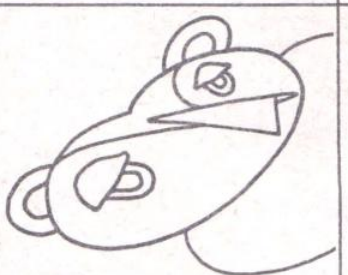

৫. গোলাপী ও হলদে ভেলভেট কাগজ দিয়ে কান, নাক ও চোখ বানিয়ে সেঁটে দাও—যেমনটি দেখানো হয়েছে।

৬. হলদে ও গোলাপী ভেলভেট কাগজ দিয়ে ওলি-র দেহটাকে সাজিয়ে দাও।

৭. কার্ড-পেপার কেটে ওলি-র পা বানাও আর সেটিকে হলদে ভেলভেট কাগজ দিয়ে জড়িয়ে দাও। বাক্সের সামনের দিকে ওলি-র দেহটি আর নীচের দিকে তার পা-দুটি সেঁটে দাও—যেমনটি দেখানো হয়েছে।

উ-উ ! ওলি প্যাঁচা তৈরী। সে তোমার জমানো সব পয়সা অতি সাবধানে রাখবে !

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড. এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ. বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

নজরে আসছে। অন্তত কুড়ি-পঁচিশ জন দস্যু তাঁবু ফেলে এখানে আড্ডা গেড়েছে। হ্যাঁ, সত্যিই জায়গাটা ওরা ভালই খুঁজে বার করেছে। যেমন নিরিবিলি, তেমনি নির্জন। এক তস্কর ছাড়া এমন ভয়াবহ জায়গা আর কার পছন্দ হবে! সুতরাং টুহো আর লুলাম নামে দুটো ছেলে যে ওদের দেখে ফেলেছে, ছেলে দুটো যে গাছের ডালে লুকিয়ে আছে, এ-কথাটা ওরা জানতে পারলে, উফ্! কী যে কাণ্ড হবে, ভাবলেই গা শিউরে ওঠে।

তাহলে টুহো আর লুলাম এখন করবেটা কী! ওরা কি এমনি করে গাছের ওপরই বসে থাকবে। সে তো আর সম্ভব নয়। ঠিক কথা, সম্ভব নয়। তবু এখন তাদের গাছ থেকে নামাও যাবে না, ভেগে পড়ার রাস্তাও ধরা যাবে না। সুতরাং অপেক্ষা তাদের করতেই হবে। করতে হবে রাতের জন্যে। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই তাদের। অগত্যা গাছেই থাকো। গাছের ডাল জাপটে সময় কাটাও। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ!

এখন একটু চোখ মেলে দ্যাখো, কী ভয়ংকর এক দুর্গম জায়গায় টুহো আর লুলাম এসে পড়েছে! অতি সাহসী মানুষেরই এদিকে আসতে গা ছমছম করবে! অথচ টুহো আর লুলাম এল কী করে! ভিন্‌দেশী ওই জলদস্যুরা কি সাধ করে এখানে আস্তানা গেড়েছে! ওরা জানে এদিকে কেউ আসে না, আসতে পারে না। এমন নিরাপদ জায়গা তুমি আর দুটি পাবে না! ওরা এসেছে এখানে প্রাণ নিতে। টুহো আর লুলাম এসেছে প্রাণ বাঁচাতে। কী আশ্চর্য দ্যাখো, আমরা তো সবাই মানুষ! অথচ নিজেরা বেঁচে থাকবে বলে একদল মানুষের আর একদল মানুষকে খুন করতে হাত কাঁপে না। তারা অন্যের সম্পদ লুঠ করে নিজেদের ভাঁড়ার ভর্তি করার জন্যে। দুনিয়ায় সবাই বড় হতে চায়। দুনিয়ায় সবাই অন্যের ধনসম্পদ লুঠ করে সুখী হতে চায়। কিন্তু অন্যের সুখ তারা সহ্য করতে পারে না। চোখ টাটায়।

এই রে, এই গণ্ডগোলের কোন্ ফাঁকে টুহো তীর-ধনুকটা খুইয় বসেছে! এখন, কেউ যদি ওদের আক্রমণ করে, ঠেকা দেবার মতো যে কিছুই নেই ওদের হাতে! কী হবে!

বলতে বলতেই হঠাৎ যেন কানে এল দূর থেকে অনেক মানুষের চিৎকারের শব্দ। টুহো আর লুলাম দুজনেই আঁতকে উঠেছে! দুজনের চোখ একইসঙ্গে ওই জলদস্যুর আস্তানার দিকে ঠিকরে পড়ল! কিন্তু না, এ-চিৎকার তো তাদের আস্তানা থেকে আসছে না। বরঞ্চ মনে হল, ওই দস্যু নিজেরাই যেন সতর্ক হয়ে নিজেদের অস্ত্র ঝটপট হাতে নিচ্ছে। হয়তো তারা আতঙ্কিত, কিন্তু যে-কোনো বিপদের জন্যে হুঁশিয়ার! দস্যুর দল সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবু ছেড়ে ঝুপঝাপ লুকিয়ে পড়ল এদিক-ওদিক। হ্যাঁ, চিৎকার এদিকেই ভেসে আসছে। কারা চিৎকার করে এগিয়ে আসছে! ওরা কি তবে টুহো আর লুলামকে খুঁজতে বেরিয়েছে! নাকি ওই জলদস্যুদের আক্রমণ করতে আসছে! ভাবতে ভাবতে টুহো আর লুলামের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। কী প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে এই গাছের ডালে তারা অপেক্ষা করছে!

হ্যাঁ, হঠাৎ দেখা গেল সেই মানুষের দলটাকে। হ্যাঁ, এরা বনেরই মানুষ। সবার হাতে তীর-ধনুক। সবার মুখেই যেন আতান্তরের ছায়া। চেঁচাচ্ছে আর সেই দুর্গম বনের আনাচে-কানাচে তন্ন-তন্ন করে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

এমনই সময় লুলাম আতঙ্কে ফিসফিসিয়ে উঠল, "টুহো!"

পলকে টুহো নিজের ঠোঁটে আঙুল চেপে 'স্-স্-স্' করে শব্দ করে ওকে কথা বলতে বারণ করল।

কিন্তু লুলাম থামল না। সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "পুরোহিত!"

টুহো আঁতকে উঠেছে, "কই?"

লুলামের ভয়ে যেন গলার স্বর আটকে আসছে। শুধু আঙুল তুলল পুরোহিতের দিকে।

আর কারো সন্দেহ নেই, টুহো আর লুলামকে ধরার জন্যেই ওরা বেরিয়ে পড়েছে। টুহোও যেন কথা বলতে পারে না। অনেক কষ্টে সে শুধু বলতে পারল, "গাছের সঙ্গে সেঁটে থাক্। কেউ না দেখতে পায়।"

অবিশ্যি ওরা যেখানে উঠেছে, সেখান থেকে ওদের কেউ দেখতে পাবে না ঠিকই, তবু সাবধানের মার নেই। কিন্তু বেশি সাবধান হতে গিয়ে টুহো যে নিজেই অমন অসাবধানের মতো কাজ করে ফেলবে, এ যেন ভাবা যায় না। হয়েছে কী, পুরোহিতের ওই দলবল দেখতে দেখতে টুহো হঠাৎ যেন কেমন বেসামাল হয়ে গেছে! মগডাল থেকে হাত ফসকে মেরেছে ডিগবাজি। এই যাঃ! পড়ল বুঝি হাত-পা ভেঙে মাটিতে! ঘাড়-মুণ্ডু গোঁত্তা মেরে প্রাণটি বুঝি গেল তার! না, না, ওই দ্যাখো, কী দারুণ বাহাদুর টুহো! পড়তে পড়তে ধরে ফেলেছে আর একটা ডাল! ঝুলে পড়েছে! বেঁচে গেছে টুহো। কিন্তু বাঁচলে কী হবে! বিপদ যখন আসে, সে তো একা আসে না। ঝুলতে গিয়ে এইস্যা ঝাঁকুনি লাগল গাছের ডালে যে, ডালপালা সব ঝমঝম করে কেঁপে উঠেছে। আর বলতে হয় না! পড়বি তো পড় সকলের নজর পড়েছে গাছের ওপর!

সত্যি! রাখে হরি, তো মারে কে! এমন একটা জায়গায় টুহো ঝুলছে, সেখানে কারো দৃষ্টিই গেল না। কী বরাত বলো! উলটে, ওই ঝাঁকুনির শব্দে লোকগুলো নিজেরাই ভড়কে গেছে। ভাবল, গাছের ওপর নিশ্চয়ই ভয়ংকর সেই জন্তু জাগুয়ার ঘুরঘুর করছে। সেই ভয়েই দলসুদ্ধ প্রায় সবকটা লোকই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "জাগুয়ার, জাগুয়ার!" বলে, ধনুকের ছিলায় তীর উঁচিয়ে এক-পা, এক-পা করে পিছু হটতে লাগল! টুহো আর লুলাম জুলজুল করে দেখছে। ভাবছে এই বুঝি একসঙ্গে সবাই তীর ছুঁড়ল। দিল বুঝি উড়িয়ে!

এমন সময়, একেবারে আচমকা, কোথায় ছিল জলদস্যুর দল, ঝুপঝাপ সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বন কাঁপিয়ে হল্লা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে! অতর্কিতে! হকচকিয়ে গেছে সবাই। পালাতেও পারে না, ধনুকে তীর নাড়াতেও পারে না। ইশ! যেন মনে হল, আকাশ থেকে বিনা মেঘে বাজ পড়ল! তাল বুঝে যে কটা লোক পালাতে গেল, তাদের সঙ্গে লেগে গেল ধুন্ধুমার লড়াই। সে কী রক্তারক্তি কাণ্ড! টুহো আর লুলাম ভয়ে একেবারে কাঠ। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সেই মারদাঙ্গার ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে। এখন যদি টুহোকে কেউ জিজ্ঞেস করে, "এই যে লড়াই হচ্ছে, তুমি কার জয় চাও? এই জলদস্যুর? নাকি, ওই পুরোহিত যে-মানুষগুলোকে ডেকে এনেছে তোমাদের ধরার জন্যে,

তাদের ?" কী উত্তর দেবে টুহো ? তোমরা বোধহয় ভাবছ, টুহো এই প্রশ্নটা শুনে নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু না। ওর কাছে এই প্রশ্নটা জলের মতো সোজা। টুহো চায়, এই দুটো দলই মারদাঙ্গা করতে-করতে মরুক। সে যেমন চায় না, বিদেশী জলদস্যু তস্করের মতো তার দেশের মানুষের রক্ত ঝরাক, রক্ত ঝরিয়ে সব লুঠ করে নিয়ে যাক। তেমনি সে এও চায় না, তার দেশেরই মানুষ, পুরোহিতের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে, তার বন্ধু লুলামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তবে কি টুহোর মন বলতে চায়, যারা অন্যায় করে, যারা নিষ্ঠুর হত্যাকারী তাদের বাঁচার কোনো অধিকার নেই এই পৃথিবীতে ! তারা মরুক, নিজেরাই, লড়তে-লড়তে ! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক যত পাপ, যত হিংসা সব !

হ্যাঁ, ওরা স্পষ্ট দেখছে, কী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই না চলছে দু'দলে ! দু'দলেই গাছের ফাঁকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে তাদের হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে চলেছে। গাছের পাতায় রক্তের ছাপ ছড়িয়ে পড়ছে। যে পারছে, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে। আর যে পারছে না, সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকছে।

হঠাৎ টুহোর চমক ভাঙল। লুলাম একটু গলার স্বর উঁচিয়েই বলল, "টুহো, ওই দেখ পুরোহিত পালাচ্ছে !"

টুহো লুলামের কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখে সত্যিই পুরোহিত ভাগছে। তাকে দেখে টুহো লুলামকে বলল, "লুলাম, এই তাল। ওরা লড়াই করুক। আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ওই পুরোহিতের মতো এই সুযোগে পালাতে পারি।"

লুলাম বলল, "কিন্তু পুরোহিত দেখতে পেলে !"

টুহো উত্তর দিল, "পুরোহিত নিজের প্রাণ নিয়েই এখন পালাতে পারে কিনা তার ঠিক নেই ! আয়, আমরা নেমে পড়ি, লড়াই শেষ হয়ে গেলে হয়তো ফাঁক পাব না।" বলে, টুহো গাছের ডালে-ডালে পা ফেলে টুপটাপ ওই ওপর থেকে নীচে নামতে লাগল। টুহোকে দেখে লুলামও ডাল থেকে ডালে লাফ মেরে ঝুপঝাপ নেমে এল। তারপর দে ছুট !

এই এক ভারী অদ্ভুত জায়গা গহন বন। একবার লুকিয়ে পড়তে পারলেই হয়, চট করে কেউ ঠাওর করতে পারবে না। ধরতেও পারবে না। কিন্তু ওরা যাবে কোথা ? ছুটলেই যে বাঁচা যায়, এমন কথা তো আর ভাবা যায় না ! সুতরাং বাঁচার ইচ্ছা যতই পেয়ে বসছে ওদের, দুর্গম বনের ঝোপ-ঝাড়ের বাধাটা যেন ততই তুচ্ছ মনে হচ্ছে !

অবশেষে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। দুজনেরই পা যেন আর উঠতে-নামতে চাইছিল না। এখানে ওরা কি একটু বসবে ? এই নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটায় ?

হ্যাঁ, ওরা থামল। সামনে বোধহয় একটা ছোট্ট ঝরনা ছুটে আসছে বনের ভেতর দিয়ে। জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বসে পড়ল দুজনেই। ক্লান্তির নিশ্বাসটাকে ধীরে-ধীরে সামলাবার চেষ্টা করল। একটু ধাতস্থ হয়ে চারপাশটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল। আপাতত কোনো বিপদ আছে বলে মনে হল না। তবু এখানে তো এভাবে বসে থাকা যায় না ! তাই লুলামই কথা বলল প্রথম। জিজ্ঞেস করল, "এরপর ?"

টুহো লুলামের মুখের দিকে চাইল।

লুলাম আবার বলল, "তুমি এত কাণ্ড না করলে, তোমার এত বিপদ হত না। সকাল যখনই হত, তখনই দেবতার

সামনে ওদের খড়্গ আমাকে আঘাত করত। আমি মরলে আর তো কোনো অশান্তি থাকত না। আমার প্রাণ কেন বাঁচাতে গেলে ? আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বিপদ তুমি নিজে ডেকে আনলে কেন টুহো ?"

টুহো লুলামের এই কথার কোনো উত্তর না দিয়ে, উলটে জিজ্ঞেস করল, "তোর খিদে পাচ্ছে না লুলাম ?"

লুলাম উত্তর দিল, "এটা বোধহয় ঠিক খিদে পাওয়ার সময় নয় !"

ঠিক বটে, এই সাংঘাতিক উত্তেজনায়, এই সময়ে খিদের কথা কার আর মনে হয়। বরঞ্চ এই সময়ে বারবার যে-কথাটা মনের ভেতর তোলপাড় করছে, সেকথা হল, এরপর কী করবে তারা ? কোথায় যাবে ?

সত্যিই তো, একটা মাথা গোঁজার মতো জায়গা না মিললে, এভাবে কতক্ষণ তারা লুকিয়ে-ছাপিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে ! এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকাটাও বোধহয় খুব বিবেচনার কাজ নয়। সুতরাং উঠতেই হবে। তারপর যে কী হবে দুজনার কেউ জানে না।

"টুহো !" যেন খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে হঠাৎ লুলাম ডেকে উঠল।

"কী ?" ভয়ার্ত কণ্ঠে সাড়া দিল টুহো।

লুলাম তেমনি ব্যস্ত হয়েই বলল, "ওই দেখ, একটা কী ঝোপের মধ্যে ঝটপট করছে।"

টুহো তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে দেখে, সত্যিই তো ! আরও একটু স্থির হয়ে দেখতে-দেখতে টুহো বলল, "একটা পাখি মনে হচ্ছে।"

লুলাম উত্তর দিল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখছ, গায়ের রঙটা কেমন জলপাইয়ের মতো সবুজ ?"

টুহো বলল, "মাথার দু'পাশে কালো কালো ছাপও দেখা যাচ্ছে।"

লুলাম বলল, "দেখতে পাচ্ছ ঠোঁটের দু'পাশটা কেমন এবড়ো-খেবড়ো।"

টুহো লুলামের হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, "চ, দেখি।" বলে দুজনেই সেই ঝোপের দিকে ছুটল।

কাছে এসে লুলাম বলল, "দেখলে, আমি ঠিক বলেছি পাখি।"

টুহো আরও একটু ভাল করে দেখল। তারপর ঝোপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পাখিটাকে টেনে বার করে আনল। এনে লুলামের চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "জানিস, এ পাখিটার নাম কী ?"

লুলাম বলল, "মটমট না ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু দেখছিস গাছের কাঁটা ফুটে পাখিটার ডানার পালক খসেছে ?"

"কী করে এমন হল বল তো ?"

"বুঝতে পারছি না !"

"আর বোধহয় উড়তে পারবে না।" বলে লুলাম পাখিটার গায়ে আলতো ছোঁয়ায় হাত বুলাল।

টুহো বললে, "দেখি, উড়তে পারে কিনা।" বলে পাখিটাকে ধীরে ধীরে মাটির ওপর বসিয়ে দিল।

কিন্তু উড়তে সে পারল না। একটা ডানা গুটিয়ে আর একটা ডানা মেলে ধরে লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটতে লাগল।

লুলাম বলল, "কই, পারছে না তো ?"

একটু যেন ব্যস্ত হয়েই টুহো এগিয়ে গেল। পাখিটাকে তুলে নিল মাটি থেকে। তারপর বলল, "ডানাটা ভাঙল নাকি !" বলে ডানাটা আস্তে একটু টান দিল। বুঝতে পারল টুহো, ভাঙেনি। কিন্তু জখম হয়েছে মোক্ষম।

লুলাম জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কি পাখিটা উড়তে পারবে না।"

টুহো বলল, "আয়, দেখি। ওর ওই ব্যথার জায়গায় একটু জল ছিটিয়ে দিলে হয়ত চাঙ্গা হতে পারে।"

"ঠিক বলেছিস।" বলে লুলাম আর টুহো ঝরনার শব্দ শুনতে শুনতে তার জলের কাছে পৌঁছে গেল। ছোট্ট ঝরনার ঝকঝকে জল, যেন ঝলক ঝলক রুপো। গড়িয়ে নামছে ওপর থেকে নীচে টলটল করে। পাথরের গায়ে নাচতে নাচতে নদীর গান গেয়ে ছুটে চলেছে। পাখিটাকে বুকে নিয়ে লুলামের সঙ্গে টুহো একটা পাথরে লাফ দিল। জলের কাছে হেঁট হয়ে হাত ডুবাল লুলাম। আঁজলা ভরে জল নিয়ে পাখিটার গায়ে ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা হাঁ করল। পাখিটার তেষ্টা পেয়েছে। ওর ঠোঁটে একটি একটি জলের ফোঁটা গড়িয়ে-গড়িয়ে ঢেলে দিল লুলাম। পাখিটা যেন গা-ঝাড়া দিচ্ছে ! কেমন চনমন করে চেয়ে দেখছে এধার-ওধার ! এ কী, টুহো আর লুলামের মুখের দিকেও অমন জুলুক-জুলুক তাকায় কেন ? তবে কি পাখি বলতে চায়, "এবার আমায় ছেড়ে দাও !"

হয়তো তাই হবে। হয়তো টুহো আর লুলাম ওর মনের কথা বুঝতে পারে। তাই টুহো বলল, "এবার বোধহয় উড়তে পারবে। দেখছিস লুলাম, এখন যেন ডানাটা নাড়াবার চেষ্টা করছে ?"

লুলাম বলল, "দেখ না ছেড়ে দিয়ে !"

"যদি উড়তে গিয়ে থুবড়ে পড়ে !" যেন ভয় পেল টুহো।

"কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। বাঁচলে ও তো আকাশেই বাঁচবে। আর আকাশে যদি উড়তে না-চায়, আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।" উত্তর দিল লুলাম।

"বেশ, তবে তাই দেখি।" বলে টুহো পাখিকে ছেড়েই দিল। উড়ল সে, কিন্তু হাওয়ায় সে ভাসতে পারল না। টাল খেয়ে পড়ে গেল।

ইশ ! খুব বরাত ! জলের ওপর পড়ে যে নাকানি-চোবানি খায়নি এই রক্ষে। পড়ল আর একটা মস্ত পাথরের ওপর। পড়েই কিন্তু উঠে পড়ল। পাথরটার ওপরেই কবার তুড়ুক-তুড়ুক লাফাল। তারপরে দ্যাখো, ওই তো সোঁ করে উড়ে গেল ! ওই তো একটা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে ! লেজটা আর ঘাড়টা কেমন দোলাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, টুহো আর লুলামকে কেমন দেখছে। এই দ্যাখো, ডানা ছড়িয়ে লাফ দিল আকাশে। উড়ছে পাখিটা। উড়তে উড়তে ক'বার ঘুরপাক খেয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর দেখা গেল না।

কী খুশি লুলাম। হেসে উঠল লুলাম। লুলামের হাসি দেখে টুহোও হেসে উঠেছে। হাতে হাতে তালি দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে দুজনেই। তারপর থতমত খেয়ে গেছে। মুখের হাসি তাদের মুখেই হারিয়ে গেছে ! ওদের সামনে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে ! তার হাতে তীর-ধনুক। তাদের দিকে নিশান করে উঁচিয়ে আছে ! কী দশাসই চেহারা লোকটার ! যেন গুণ্ডা !

"হা-হা-হা।" লোকটা বাজখাঁই গলায় হেসে উঠল।

টুহো আর লুলামের বুকটা দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠল। না-পারে নড়তে, না কিছু করতে!

লোকটা হাসতে-হাসতেই বললে, "খুব যে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিলি! ভেবেছিস, পার পেয়ে যাবি! আমি কি মরে গেছি! আমাকে চিনিস?"

টুহো আর লুলাম লোকটার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সে তীরটা তেমনি উঁচিয়ে বলে চলল, "আমায় যদি চিনতে না পারিস তো শুনে রাখ, আমার নাম টিংকুমাংগো।" বলেই আবার হা-হা-হা করে হেসে উঠল।

নামটা শুনতেই ছ্যাঁত করে চমকে উঠেছে ওদের দুজনারই বুক। কারণ টিংকুমাংগোকে ওরা আগে দেখেনি ঠিকই, কিন্তু নাম শুনেছে। এই টিংকুমাংগোই হচ্ছে সেই ভয়ংকর ঘাতক! এই টিংকুমাংগোই দেবতার সামনে মানুষকে বলি দেয়! লুলামকেও বলি দেবে!

এবার টিংকুমাংগো হাতের ধনুকটাকে আরও একটু শক্ত করে ধরে বলল, "যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস, সেইখানেই থাকবি। এক পা নড়লেই তীরের ঘায়ে শেষ করে ফেলব।" বলে টিংকুমাংগো ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল টুহো আর লুলাম। এমনকী, কেউ কারো দিকে চাইবারও সাহস পেল না। আর সন্দেহ নেই, দুজনেই ধরা পড়ে গেছে। পালাতে গেলেই নির্ঘাত মরণ। অথচ টুহোর মনের ভেতরটা যেন জ্বলে উঠছে। মনে হচ্ছে, এখনই ওই ঘাতকের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! কিন্তু না। সে তা করল না। কারণ ওর ঘাড়ে পড়তে গেলেই, ও তীরটা ছুঁড়ে দিতে পারে। তখন যে তার এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে! এভাবে না-মরে, মরণের সঙ্গে লড়াইটা তাকে করতে হবে বুদ্ধিমানের মতো। সুতরাং পুতুলের মতো তারা দাঁড়িয়েই রইল।

এখন একেবারে সামনে এসে গেছে টিংকুমাংগো। সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে টুহোর গলায় একটা রদ্দা মারল। তারপর টুহোর হাতটা ধরে এমন মোচড় দিল, ওর যেন প্রাণটা বেরিয়ে যায়। ধনুকটাকে ঝটপট কাঁধে ফেলে আর একহাত দিয়ে লুলামের চুলের মুঠিটা খামচে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল। যেতে যেতে এমন হুঙ্কার ছাড়তে লাগল, যেন এখনই কেটে ফেলে!

লোকটা যে তাদের কাটবেই, এখন এ-কথাটা টুহো আর লুলাম স্পষ্ট বুঝে গেছে। ওরা প্রায় যন্ত্রের মতো ওই টিংকুমাংগোর গোঁত্তা খেতে-খেতে এখন যে কোথায় চলেছে, বুঝতে পারে না। অবিশ্যি যে-কথাটা বুঝতে পারছে, তা হল রেহাই তাদের নেই। হত্যা তাদের করা হবে ঠিকই। কিন্তু কখন?

এতক্ষণ ধরে হুঙ্কার ছাড়ার পর টিংকুমাংগো এবার মুখ খুললে। গাঁক-গাঁক করে ধমকে উঠল, "দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে যে পালায়, সে কোনোদিন রেহাই পায় না। এবার কে তোদের বাঁচাবে রে নচ্ছার? সামনে চেয়ে দ্যাখ, কোথায় নিয়ে এসেছি তোদের!"

সামনে চেয়ে দেখল টুহো আর লুলাম। শিউরে উঠল। কারণ সামনেই হত্যা-মঞ্চ!

টিংকুমাংগো টুহো আর লুলামের কাঁচুমাচু মুখ দেখে, ভীষণ চিৎকার করে হেসে উঠল, "হো-হো-হো।" হাসতে-হাসতেই বলল, "ওইখানেই তোদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। হা-হা-হা!"

হ্যাঁ, হত্যা-মঞ্চের চারিদিকে পাথর দিয়ে ঘেরা খুব উঁচু পাঁচিল। মধ্যিখানে একটা উঁচুমতো বেদী দেখা যাচ্ছে। ওইটাই বোধহয়, হত্যা-মঞ্চ। ওই পাথর-ঘেরা পাঁচিলের গায়ে একটা মস্ত ফটক। গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে সেই ফটক তৈরি হয়েছে। একটা ঢাপ্পুস তালা ঝুলছে ফটকের গায়ে। অবিশ্যি ফটকের গুঁড়িগুলো ফাঁক-ফাঁক। ওই ফাঁকে চোখ রেখে ভেতর থেকে ফটকের বাইরেটা, কিংবা বাইরে থেকে ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

টিংকুমাংগো টুহো আর লুলামকে টানতে-টানতে সেই ফটকের সামনে নিয়ে এল। দুজনকে টিংকুমাংগো একটা হাত দিয়ে জাপটে ধরল। বাপ রে বাপ! কী ক্ষমতা! টুহো আর লুলামের ট্যাঁ-ফুঁ করারও শক্তি নেই। আর একটা হাত দিয়ে কোমর থেকে ফটকের চাবি বার করলে। তালায় লাগিয়ে ফটকটা খুলে ফেললে। লাথি মেরে ফটকের পাল্লাদুটো ফাঁক করে টুহো আর লুলামকে তার মধ্যে ঠেলে দিলে। পাথর-ঘেরা সেই হত্যা-মঞ্চের মধ্যে ছিটকে পড়ল টুহো আর লুলাম। ধড়ফড় করে উঠতে-না-উঠতেই টিংকুমাংগো বাইরে থেকে ফটকটা বন্ধ করে দিয়েছে। টুহো আর লুলাম নির্বাক, হতভম্ব! চিৎকার করা তো দূরের কথা, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বেরুল না তাদের। শুধু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এরপর?

কিন্তু হঠাৎ যে কী হল কে জানে, টিংকুমাংগো চিৎকার করে উঠেছে! উরিব্বাস! তার সেই বাজখাঁই গলায় সে কী বোম-ফট চিৎকার! আচমকা অমন চিৎকার শুনলে বুকের ভেতরটা কার না ভয়ে লম্ফঝম্প লাগায়! টুহো আর লুলাম তো নেহাতই বাচ্চা! কিন্তু আশ্চর্য, টুহো একটু দোনো-মনো করলেও, লুলাম ছুট দিল। ফটকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। তারপর প্রায় গলা ফাটিয়ে ডাক দিল, "টুহো!"

ডাক শুনে টুহোও ছুটে এসেছে। লুলামের পাশে দাঁড়াতেই সে ব্যস্ত হয়ে বললে, "দেখ, দেখ!"

টুহো চোখ মেলেই হকচকিয়ে গেছে! দেখে, একটা পাখি। কেমন যেন সন্দেহ হয় টুহোর। মনে হয়, যেন সেই মটমট পাখিটা। সেই পাখিটা টিংকুমাংগোর মাথার ওপর চরকি খাচ্ছে, আর যেই না সুযোগ পাচ্ছে মাথার ওপর ঠোঁটের ঠোক্কর ঝাড়ছে। টিংকুমাংগো যতবার তালায় চাবি আঁটতে যায়, ততবারই এই কাণ্ড। টিংকুমাংগো না পারে তালায় চাবি দিতে, না পারে পাখিটাকে কব্জা করতে। শুধু চেল্লায়, আর লাফ মারে!

লুলামই বলল, "টুহো, টুহো, এটা কি সেই পাখিটা, মটমট?" লুলাম বলতে-বলতে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।" উত্তর দিল টুহো, "এই পাখিটাকেই আমরা বাঁচিয়েছি। আমরা আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি।"

এই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে দেখতে এবার দুজনেই যেন ভীষণ উত্তেজিত। টিংকুমাংগোকে কিছুতেই ছাড়বে না পাখি! ঝাপটা মেরে মেরে পাখি যেন টিংকুমাংগোকে পাগল করে ছাড়বে।

এরই ফাঁকে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে, দেখে টুহো লুলাম দুজনেই থ। হল কী, টিংকুমাংগো নিজের মাথা বাঁচাতে গিয়ে যেই আঁকপাঁক করে দুটি হাতই মাথায় তুলেছে, অমনি পাখি ছোঁ মেরেছে। হাত থেকে ফটকের চাবিটা নিয়ে হু-স্-স্। পাখি হাওয়া। টিংকুমাংগোর যেন মাথায় বাজ পড়ল। আঁতকে উঠে সে কী চীৎকার! "চাবি, চাবি! চাবি নিয়ে পাখি পালাল।" বলতে-বলতে পাখির পেছনে ছোটা দিল। কিন্তু পাখি তো আকাশে। ঠোঁটে চাবি লেপটে ওর মাথার ওপর চরকি খাচ্ছে! আর কি ধরা যায়!

টুহো বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে লোকটা ফটকে তালা আঁটতে পারেনি। তাই, আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে ডাক দিল, "লুলাম, টিংকুমাংগো ফটকে তালা লাগাতে পারেনি নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই খোলা। আয় দেখি।"

লুলামও সঙ্গে সঙ্গে ওরই মতো খুশি হয়ে বলে উঠল, "ঠিক বলেছিস। ফটক ঠেললেই খুলে যাবে।"

বলে, দুজনেই ফটকে ঠেলা মারলে। না, ফটক খুলল না। দারুণ ভারী। যেন খুলতেই চায় না। ওরাও কি ছাড়বার পাত্তর। এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে, মরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই প্রাণপণে হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি করে একটুখানি নড়াতে পারল ফটকটা। ওই একটুখানি ফাঁকের ভেতরই অনেক কষ্টে মাথা গলিয়ে, সুড়ুত করে বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। টিংকুমাংগো দেখতে পেলই না। দেখবে কী, সে তখনও পাখির সঙ্গে পাঁয়তারা কষছে। এই পালাবার তাল।

কিন্তু পালাতে গিয়ে টুহোর কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। এই রে, দু-চারটে লোক যে জড়ো হয়ে গেছে! হয়তো টিংকুমাংগোর চেঁচামেচি শুনে! দেখতে পেল নাকি টুহো আর লুলামকে? না। ওরা তো পাখির সঙ্গে টিংকুমাংগোর নাচন-কোঁদন দেখতেই মত্ত। আর কোনো কথা আছে! টুহো লুলামের হাত ধরে ভোঁ-কাট্টা! একটা বেশ ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে গিয়ে দুজনে লুকিয়ে, নিঃসাড়ে পাখির সঙ্গে টিংকুমাংগোর আস্ফালন দেখতে লাগল।

দেখতে-দেখতে টুহো আর লুলামের চক্ষুস্থির! ও কী, ও কী! পাখিটার গায়ের সবুজ রঙ হঠাৎ কখন যেন হলদে হয়ে গেছে! ভেলকি দেখছে না তো! দুজনেই হাঁদারামের মতো পাখির দিকে চেয়ে-চেয়ে ঢোক গিলতে লাগল! গিলতে-গিলতে লুলামই কথা বলল, "সবুজ পাখিটা হলদে হয়ে গেল কী করে, টুহো?"

টুহো উত্তর দিল, "বুঝতে পারছি না।"

দ্যাখো, দ্যাখো, টিংকুমাংগোর নজর এখন আর চাবির দিকে নেই। তার নজর পড়েছে, পাখির রঙের দিকে! টিংকুমাংগোর লম্ফঝম্প এখন একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! কী ব্যাপার! সেও যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে! অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে পাখিটার দিকে!

কিন্তু টিংকুমাংগো থমকে দাঁড়ালে কী হবে? এতক্ষণ যে লোকগুলো জড়ো হয়ে টিংকুমাংগোর কাণ্ডকারখানা দেখছিল, তারাই এবার পাখির পেছনে ছোটাছুটি আর হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলে। এ তো আচ্ছা ভেল্‌কি! পাখির যেন ভয়ও নেই, ডরও নেই। অতগুলো মানুষকে ভড়কি দিয়ে হাওয়ায় চরকি খেয়ে আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে!

আরিব্বাস! হঠাৎ আবার এ কী তাজ্জব ব্যাপার! পাখির

গায়ের হলদে রঙ হঠাৎ যেন সোনার রঙে ঝলসে ওঠে ! মনে হল, যেন একতাল কাঁচা সোনার জ্যান্ত পাখি আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক মেরে উড়ে বেড়াচ্ছে ! আর দেখতে ! কোথায় চাবি আর কোথায় কী ! টিংকুমাংগোর চোখদুটো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল ! সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, "সোনা, সোনা··· ।" বলেই, পাখিটাকে ধরার জন্যে তুর্কিনাচন শুরু করে দিলে । নাচছে টিংকুমাংগো, সঙ্গে হাঁকছে ওই যত লোক !

এমন খবর কি আর চাপা থাকে ! এ যে সোনার খবর ! তার ওপরে জ্যান্ত সোনা । খবর পৌঁছে গেল বনের সর্দারের কানে । সরেজমিনে তদারক করতে তিনিও হাজির । লোকটাকে দেখতে যেমন ঢ্যাপ্পুস-ঢপঢপ, তেমনি গম্ভীর-গমগম ! তিনি কোনোদিন যে হাত-পা তুলে পাখি ধরার জন্যে নাচানাচি শুরু করবেন, এ-কথা কেউ ভাবতেই পারে না । কিন্তু সেই তিনিও থাকতে পারলেন না । সোনা দেখে, কানা হলেন । লেগে পড়লেন টিংকুমাংগোর সঙ্গে লাফালাফি ! কিন্তু পাখির বয়েই গেছে ! সে যেমন উড়ছিল, তেমনিই উড়ছে !

এমন সময় হল কী, পাখিটা উড়তে-উড়তে একটা গাছের ডালে গিয়ে বসে পড়ল । অমনি সেই মস্ত বড় গাছটা সোনার আলোয় ঝলমল করে উঠল । যত লোক ছিল সঙ্গে সঙ্গে গাছের দিকে ছুট মারলে । তাদের সঙ্গে ছুটে গেল টিংকুমাংগো । ছুট দিল বনের সর্দার । সবার আগে গাছে উঠে পাখি ধরার জন্যে লেগে গেল হুড়োহুড়ি । আগে যদি যায় টিংকুমাংগো, অমনি তার ঠ্যাংটা ধরে টেনে নামায় অন্য সবাই । ফাঁকতালে সর্দার যেই উঠতে যাবে, অমনি তাকে জাপটে ধরে আর একদল লোক টান মারে । টান মেরে আর একদল লোক যেই না গাছের ওপর লাফ দিতে যায়, অমনি আর এক কাণ্ড ! কোথায় ছিল পুরোহিত, ছুটে এসেছে । বনের সর্দারকে ঝাপটা মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি পুরোহিত । ওই জ্যান্ত সোনা আমার ।"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের কথার ওপর কথা চড়িয়ে সর্দার চেঁচাল, "এ পাখি বনের । আমি বনের সর্দার । এ সোনা আমার ।"

সর্দার থামতে-না-থামতে টিংকুমাংগো চেঁচাল, "আমি আছি, তাই দেবতা আছেন । মানুষ কাটি তাই, সবাই বাঁচেন । ও সোনা আমার ।"

তারপর "আমার সোনা, আমার সোনা" বলে নানানজনে নানান সুরে চিল্লিয়ে এমন গলাবাজি করতে লাগল যে, সেখানে টেঁকে কে ? পাখির ঠোঁটে সেই চাবির কথা ছেড়েই দাও, অমন যে টুহো আর লুলাম, তাদের কথাও কারো খেয়াল নেই ! এখন সবার চোখ ওই জ্যান্ত সোনার দিকে ! অবিশ্যি বুড়োদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে টুহো আর লুলামের তো মজা লাগারই কথা ! ওরা ভাবছে, সোনা নিয়ে এই ধামসাধামসিটা আরও চলুক অনেকক্ষণ । তা বটে, এখনও ঘুঁসোঘুঁসি হয়নি ঠিকই, কিন্তু টানামানিটা বেশ জমেছে !

হঠাৎ টুহো আর লুলাম দেখে কী, গাছে উঠতে না-পেরে, একদল লোক গোটা গাছটাই উপড়ে ফেলার জন্যে হুমড়ি খেয়ে নাড়ানাড়ি লাগিয়ে দিলে । এই বুঝি ঘাড়ে পড়ল ! পাখি বুঝি ধরা পড়ল !

হুঁঃ ! পাখির বয়েই গেছে । অত ঠেলামেলি, অত ধাক্কাধাক্কি, অত চিৎকার-চেঁচামেচি, যেন পাখি কেয়ারই করে না । যেমন বসেছিল গাছে, তেমনি বসে রইল ঠোঁটে চাবিকাঠিটি নিয়ে ।

এদিকে খবরটা যত ছড়াতে লাগল, মানুষজনের ভিড়ও তত বাড়তে লাগল । বাড়তে বাড়তে লোকে লোকারণ্য । জ্যান্ত সোনা ধরার জন্যে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল । অত লোকের ভিড়ের ঠেলায় কোথায় গেল টিংকুমাংগো, কোথায় বনের সর্দার, আর কোথায় বা পুরোহিত ! তারা ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে "সোনা, সোনা" করে গলা ফাটাতে লাগল !

এমন সময় আচমকা গুড়ু-গুড়ু করে যেন মাটি কেঁপে উঠল । ওই দ্যাখো, ঠেলামেলির ঠোক্করে মাটি উপড়ে গাছটা লটকে পড়ছে ! এই সব্বনাশ ! দ্যাখো দ্যাখো, মানুষের ঘাড়ের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল যে গাছটা ! তাই না দেখে ভয়ে আর্তনাদ করে পালাতে গিয়ে পড়বি তো পড় গাছের নীচে ! কেউ মরল, কারো ঘাড় ভাঙল, কেউ পালাল !

আর, এদিকে পাখিটা কিন্তু ভয়ও পায় না, কারো তোয়াক্কাও রাখে না । ফুড়ুত করে উড়ে গাছের ডাল থেকে নীল আকাশে ঘুরতে লাগল । সত্যি ! নীল আকাশের নীচে সেই সোনায় গড়া পাখির দিকে তাকালে লোভ সামলায় কার সাধ্যি ! যে মানুষগুলো গাছের নীচে পড়ল না, বা মরল না, তারা ভাবল, সোনা বুঝি এই উড়ে পালায় । মানুষগুলো সব খ্যাপার মতো আকাশে হাত তুলে লাফাতে লাগল । আর "আয়, আয়" করে হাঁপাতে লাগল ।

দেখে তো টুহোর চক্ষু কপালে । কথা বলবে কী, যেন সে স্বপ্ন দেখছে ! ঠোঁটের ফাঁকে কথা এলে তবে তো ! তবু বলতে হবে লুলামকে । এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে, সে একটুও ভড়কাল না । উলটে বলে উঠল, "টুহো, এবার আমরা বেঁচে গেছি ।"

লুলামের আচমকা কথা শুনে টুহো চমকে উঠল । তার যেন স্বপ্ন ভাঙল । লুলামের কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল, "এখনও কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না ।"

লুলামও তেমনি নিচু গলায় স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন ও কথা বলছ ? দেখতে পাচ্ছ না, সোনার লোভে লোকগুলোর চেহারা কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে ! আমাদের কথা ওদের আর মনেই নেই ।"

এবার টুহো পাখিটার দিকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে বলল, "কিন্তু লুলাম, পাখিটা কি সত্যি সোনার ?"

"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে ।" উত্তর দিল লুলাম ।

"ভাবতে অবাক লাগে, সবুজ পাখি সোনার পাখি হয়ে গেল কেমন করে !"

লুলাম বলল, "পাখিটা বোধহয় জাদু জানে । আমরা যে ওকে বাঁচিয়েছি একথা সে ভোলেনি । তাই আমাদের বাঁচানোর জন্যেই বোধহয় তার এই জাদুর খেলা । মানুষগুলোকে লোভে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে । লোকগুলোও আমাদের কথা একদম ভুলে গেছে ।"

এমন সময় টুহো, লুলাম দুজনেই চমকে উঠেছে । কে যেন পাখিটাকে তাক করে একটা শূন্যে পাথর ছুড়ল । অবিশ্যি পাখির গায়ে লাগল না । কিন্তু তার দেখাদেখি অমনি সঙ্গে সঙ্গে যত লোক ছিল সবাই মাটি থেকে পাথর তুলে পাখির

দিকে ছুড়ে মারে। পাখির লাগেই না। কখনও গোঁত্তা মেরে, কখনও ভড়কি দিয়ে পাখি এপাশ-ওপাশে উড়ে পালায়। ততই যেন খেপে ওঠে মানুষগুলো। পাথর তোলে আর শূন্যে ছোড়ে। অথচ দেখ, পাখি কিন্তু ভয়ে পালাচ্ছে না সেখান থেকে। ঠিক তাদের মাথার ওপর চরকি খাচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, পাখিটা উড়তে উড়তে এগিয়ে চলল! মানুষগুলোও চক্ষু কপালে তুলে পাখির পিছু ছুটল। কোথায় ঝোপ, কোথায় কাঁটা, কোথায় ঢিপি আর কোথায় খন্দ, সেসব তাদের খেয়ালই নেই। উড়তে উড়তে পাখিটা যেই পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়েছে, লোকগুলোও পাহাড় টপকে ওপরে উঠেছে। আবার যেই পাহাড়ের আড়াল থেকে পাখিটা গাছের ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে, অমনি দুড়দাড়িয়ে মানুষগুলো পাহাড় থেকে নীচে নামছে। কী হুল্লোড়বাজি রে বাবা! পাখিটা মানুষগুলোকে একেবারে চোখের জলে, নাকের জলে করে ছাড়ছে!

হঠাৎ দেখা গেল, পাখিটা উড়তে উড়তে তিন পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা সরোবরের ওপর এসে পড়েছে। পাখির সেই সোনার দেহের ছায়াটা জলের ওপর পড়ে যেই ঝলমল করে উঠল, অমনি লোকগুলো পাখিকে তাক করে আবার পাথর ছুড়তে লাগল। পাথরগুলো টপাটপ জলের ওপর পড়ে, আর সরোবরের জল ঝিলিক ঝিলিক করে।

এমন সময় হল কী, একটা পাথর বেটপকা পাখির গায়ে লেগে গেছে! ইশ্, যেই না লাগা, পাখি কাত! তার সোনার দেহটা নিয়ে জলের ওপর ছিটকে পড়ে টুপ করে তলিয়ে গেল। আর দেখতে হয়! ওই অতগুলো মানুষ একসঙ্গে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে সোনার পাখি হাতাবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলে! এ আগে লাফায়, তো ও তাকে টেনে ধরে। উনি যেই নামতে যাবেন, ইনি তাঁকে লেঙ্গি মারেন! সে এক ভয়ংকর টানামানি। তারপর হাতাহাতি। শেষে, হাত থেকে লাঠালাঠি। লেগে গেল দাঙ্গা!

লুলাম চেঁচায়, "টুহো, দ্যাখ, দ্যাখ, টিংকুমাংগো পুরোহিতের গলা টিপে ধরেছে!"

টুহো দেখতে দেখতে লাফিয়ে উঠল। বলল, "লুলাম, এই আমাদের পালাবার সুযোগ!"

লুলাম কিন্তু পালাবার পথ না খুঁজে চেঁচাল, "এখনও সময় হয়নি। আর একটু দাঁড়াতে হবে। অন্তত কে আগে মরে, সেটা তো দেখতে হবে।"

হ্যাঁ, টিংকুমাংগোর সঙ্গে পুরোহিতের লেগে গেছে ঝটাপটি। আর ঠিক তখনই তাল বুঝে বনের সর্দার জলের ভেতর মেরেছে লাফ! যেই লাফ মারা সবাই একেবারে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, "ধর, ধর!"

বলতে না বলতেই, যত লোক ছিল সবাই জলের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তাদের সঙ্গে টিংকুমাংগোও লাফ দিল, পুরোহিতও ঝাঁপ দিল। কিন্তু কেউ তো জানে না, সরোবরটা কত গভীর, কোন্‌খানটায় ঘূর্ণিটান, জলের নীচে খরস্রোত! ব্যস! জলে পড়তেই, ওই দ্যাখো, পুরোহিত জলের ভেতর খাবি খাচ্ছে! সর্দার জলের তলায় টাল খাচ্ছে! হোঁতকা হোঁদল টিংকুমাংগো স্রোতের টানে পাক খাচ্ছে। আর তাদের সঙ্গে সেই অগুনতি মানুষ জলে পড়ে বেসামাল। অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে!

হায়! হায়! মানুষগুলো যে জলের নীচে ডুবেই গেল! অত চিৎকার, এত লোভ, এত হল্লা সব যে থিতিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। কী ভয়ংকর নিস্তব্ধতা! সরোবরের নিথর জলের ওপর কেমন যেন একটা ভয়াল রহস্য উঁকিঝুঁকি মারছে!

আড়াল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এল টুহো আর লুলাম। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। চোখে তাদের যত ভয়, তার চেয়ে বিস্ময় বেশি! খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সরোবরের কাছাকাছি। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল স্থির জলের দিকে। একটি মানুষেরও চিহ্ন নেই। তবে কি মানুষগুলো জলের গভীরে ডুবে ডুবে সেই সোনার পাখির খোঁজ করছে! কিংবা সোনার জন্যে লড়াই করছে। মানুষ মরে গেলেও কি তার লোভ মরে না? এর উত্তর জানে না টুহো, জানে না লুলাম। ওরা শুধু ভাবে সেই পাখিটার কথা, সেই সবুজ রঙের পাখি, যার গায়ে সোনা ছিল না, ছিল শুধু নরম তুলতুলে পালকের ওপর রঙ আর রঙ! যে রঙ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, ভালবাসায় বুক ভরে ওঠে!

হ্যাঁ, টুহো আর লুলামের ভালবাসায় ভুলেই বোধহয়, সেই সবুজ পাখি, সোনা হয়েছে! সেই সোনার পাখি নিজে জলে ডুবে টুহো আর লুলামের প্রাণ বাঁচিয়েছে! সরোবরে জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন ভার হয়ে আসে টুহো আর লুলামের মন দুটি। টুহো লুলামের হাতটি ধরে। সেই স্বচ্ছ জলে দুজনায় দুটি হাত নামিয়ে মনে মনে বলে উঠল, "পাখি, তোমাকে ভুলব না, কোনোদিনও না।" তারপর তাদের দুজনারই গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটাগুলি উপচে পড়ে। একটি একটি ফোঁটা সেই সরোবরের জলের ওপর গড়িয়ে যায়! ওমা। সঙ্গে সঙ্গে এ কী দেখা যায়! সেই সরোবরের জলে যেন মেঘের ছায়া নেমেছে! চকিতে টুহো আর লুলাম আকাশের দিকে তাকাল! তারা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, আকাশে মেঘ। বৃষ্টির মেঘ! হ্যাঁ, বাতাসে গন্ধ! বাদলের গন্ধ। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল! বিদ্যুৎ চমকে উঠল। গুরুগুরু গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল! ওই তো গাছের পাতায় বাতাসের ঢেউ লেগেছে। ওই তো সরোবরের জলে, মেঘের বুক থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি টুপটাপ ছড়িয়ে পড়ছে! ওই তো, অঝোর ধারায় ঝরছে তারা। দেখছ না, যেন রাশি-রাশি মুক্তা মুঠি-মুঠি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল টুহো আর লুলাম। তারা নেচে উঠল। বৃষ্টির জলে ভিজে নেয়ে তারা তোলপাড় শুরু করে দিল। তারপর তারা ছুট দিল। ছুট দিল বন পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে। তাদের পেছনে পেছনে হাওয়া ছোটে, হাওয়ার সঙ্গে মেঘ ছোটে, মেঘের সঙ্গে বৃষ্টি! ওরা বুঝি আর ঘরে ফিরবে না। ওরা বুঝি এমনি করে হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে সেখানে, যেখানে প্রাণ আছে। যেখানে মানুষ মানুষকে কাটে না। মানুষ মানুষকে হিংসা করে না!

সে দেশ কোথায়, কোন্ অজানা রাজ্যে, জানে না তারা! তবু সেই দেশই খুঁজে বেড়াবে তারা এখন। তারপর খুঁজে পেলে, অনেক খুশির মধ্যে সেখানে নিশ্চিন্তে ভাববে একজনের কথা। সে-জন হল, একটি জলপাই-সবুজ পাখি!

ছবি : দেবাশিস দেব

হার্সিসাহেবের কাণ্ড

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

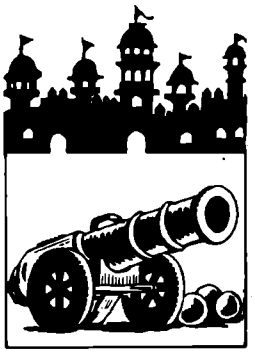

হার্সি (Hersey) পরিবারের নাম সাধারণত ইতিহাসের বইয়ে পাওয়া যাবে না। তাঁরা খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁরা এদেশের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন, বিয়েও করতেন ভারতীয় মেয়েদের। হার্সির প্রথম নাম হায়দার। তাঁর মা জাঠ পরিবারের মেয়ে। লর্ড ওয়েলেসলির আগে পর্যন্ত তাঁরা ভারতীয় নবাব কিংবা রাজাদের কাছে চাকরি করেছেন। প্রত্যেকের কিছু কিছু সৈন্য থাকত। ভাল সৈনিক বলে ইউরেশিয়ানদের খ্যাতি ছিল। তাঁরা ভাল গোলন্দাজ হতেন। কেউ ছোটখাটো রাজ্যও গড়ে নিয়েছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলির সময় থেকে এইসব অর্ধ-বিদেশীদের সুখের দিন শেষ হল। তিনি হুকুম দিলেন বিদেশীদের এভাবে চাকরি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যান্যদের মতো হার্সি-পরিবারেরও কিছু অসুবিধা হল। তবে মেজর হার্সি অন্যদের থেকে একটু আলাদা ধরনের ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাজা কিংবা নবাবদের কাছে চাকরি করেছেন। তাঁর পরিবারের অনেকে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলেও কাজ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর হার্সি অযোধ্যার নবাবের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন। একসময় তিনি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে ফরাসি অধিনায়ক পেরনের অধীনেও চাকরি করেছেন। পরে তিনি দল ছেড়ে জর্জ টমাসের কাছে চাকরি নিয়েছিলেন। জর্জ টমাস আয়ারল্যাণ্ডের লোক। তিনি পেরনের শত্রু ছিলেন। হার্সির ইচ্ছা হল, তিনি রাজপুতানায় কোথাও তাঁর নিজের একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তুলবেন। কিন্তু ওয়েলেসলির সময় থেকে এ আর সম্ভব থাকল না। বেশির ভাগ সৈন্যদের ছাড়িয়ে দিতে হল এবং অল্প লোক নিয়ে তিনি কোম্পানির সৈন্যদলে যোগ দিলেন। কোম্পানির কাছ থেকে মাসিক আটশো টাকা পেতেন।

মারাঠাযুদ্ধ শেষ হবার পরে হার্সি একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করে রোহিলখণ্ডে একটি গ্রামে গিয়ে বসতি করলেন। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা হার্সির স্বভাবে ছিল না। তিনি একদল পরিব্রাজকের সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষে গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তির জায়গা জরিপ করতে বেরিয়েছিলেন।

এর চার বছর পরে তিনি একটি খুব বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন। উইলিয়াম মুরক্রফট নামে একজন পণ্ডিত পরিব্রাজকের সঙ্গে যোগ দিয়ে হার্সি মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন। তাঁদের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানস-সরোবর জরিপ করা, আর সে-দেশ থেকে ভেড়ার লোমের নমুনা সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসা। ১৮১২ সালে গরমের সময় যোশীমঠ থেকে যাত্রা করলেন। তিব্বত তখন অন্য দেশের লোকের কাছে নিষিদ্ধ দেশ। বাইরের লোক ধরা পড়লে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারত। মুরক্রফট ও হার্সি দুজনেই ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে গিয়েছিলেন। এঁরা নিশ্চয়ই হিন্দি বলতে পারতেন। মুরক্রফটের শরীর ভাল যাচ্ছিল না বলে তিনদিনের বেশি মানস-সরোবরে থাকা সম্ভব হয়নি। মুরক্রফটের লেখা একটি রোজনামচা আছে, তাতে ক্যাপ্টেন হার্সির নাম বহুবার করা হয়েছে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় এই রোজনামচা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আরও বছর-দুয়েক পরে যখন নেপালের সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ বাধল তখন হার্সি সে-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এর অল্প পরে রোহিলখণ্ডে এক বিদ্রোহের সময় আবার তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হয়ে লড়াই করেছিলেন।

১৮২৪ সালে ইংরেজরা যখন ভরতপুরে দুর্গ অবরোধ করেন হার্সিও তখন তাঁদের সঙ্গে সে-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহের আগেই কাজের জন্য হার্সির পদোন্নতি হয়েছিল। তিনি 'মেজর' হলেন।

হার্সি যে অনেক বিষয়ে সাধারণ লোকের চেয়ে অন্য ধরনের ছিলেন সেকথা তাঁর কাজ থেকে স্পষ্ট হবে। তাঁকে নির্বোধ মনে করবারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু ১৮৩২ সালে তিনি এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যে, সরকারি মহলে তাঁর নাম পুনর্বার শোনা যেতে লাগল।

কানপুরের কাছে বিঠুরে ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও থাকতেন। মারাঠাযুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক জায়গায় তাঁর বাসস্থান ঠিক করে দিয়েছিলেন। কোম্পানির কাছ থেকে তিনি বছরে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পেতেন। সেকালে অনেক টাকা। এই টাকায় তাঁর ভালভাবে দিন কেটে যেত। ইচ্ছামতো দানধ্যান করতেন। ইংরেজরাও বোধহয় চেয়েছিলেন, বাজীরাও বন্দিদশায় এ-সব করে সুখে থাকুন। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর নিজের কোনো উৎসাহ ছিল না। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা-ও নয়। তাঁর দেওয়ান রামচন্দ্র পন্ত পুনা থেকে মনিবের সঙ্গে বিঠুরে এসেছিলেন। পেশোয়ার সঙ্গে কয়েক হাজার লোকও মহারাষ্ট্র দেশ থেকে এসেছিলেন। এই নিয়ে বাজীরাওয়ের পৃথিবী। তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকত না।যখন তাঁকে এত টাকা বৃত্তি দেওয়া হল তখন ইংরেজরাও কেউ কেউ ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত কোম্পানির বেশি টাকা খরচ হবে না। বাজীরাওয়ের যা শরীর তিনি হয়তো দীর্ঘকাল বাঁচবেন না। কিন্তু তাঁদের আশার মুখে ছাই দিয়ে বাজীরাও ত্রিশ বছরের বেশি এই বৃত্তি ভোগ করেছিলেন। তবে ইংরেজদের কোনও রকম জ্বালাতন করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবু মাঝে মাঝে গুজব রটত বিঠুর থেকে গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। এসব কথা ইংরেজরাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন না।

এইরকম একটি ব্যাপার ১৮৩২ সালে ঘটেছিল। মেজর হায়দার হার্সি তার নায়ক। বাজীরাওয়ের দেওয়ান রামচন্দ্র পন্তের কাছে একজন হরকরা চিঠি নিয়ে এল। তার চাপরাসে

হার্সির নাম লেখা। রামচন্দ্র পন্ত খুব সাবধানী লোক। তিনি চিঠি নিলেন বটে কিন্তু খুললেন না, সরাসরি বিঠুরের কমিশনার জেমস ম্যানসনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানসন চিঠি খুলে দেখলেন যে সর্বনেশে ব্যাপার ঘটতে চলেছে। তিনিও বোধহয় আগে হার্সির নাম শোনেননি। কারণ গভর্নর-জেনারেলকে তিনি লিখলেন, কে একজন মেজর হার্সি চিঠি লিখেছেন, চিঠিতে বলেছেন তিনি বেরিলির লোক। চিঠিতে কতকগুলি সাংঘাতিক কথা আছে। হার্সি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি মোটামুটি এই কথা বলেছিলেন—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ শেষ হয়ে যাবে। কোম্পানির অন্য কোনো অধিকার থাকবে না, কারণ ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়াম নিজের হাতে তামাম হিন্দুস্তান নিয়ে নেবেন। কিছুদিন হল কোম্পানি সবাইয়ের মাইনে কমিয়ে দিচ্ছে। পেশোয়াকেও হয়তো এইরকম বিপদে পড়তে হবে। স্যার জন ম্যালকম তাঁর সঙ্গে খুব ভাল ব্যাবহার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতের ইংরেজরা কি পূর্ব-ব্যবস্থা মেনে চলবেন ? (অর্থাৎ তাঁর বৃত্তি কি ঠিক পাবেন ?) না-চল্যার সম্ভাবনাই বেশি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটি পথ আছে। সে হচ্ছে পেশোয়া যেন বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি তাঁর বার্ষিক বৃত্তির আট লাখ টাকা ছেড়ে দেবেন। তার বদলে দাক্ষিণাত্যে তাঁকে একটি জায়গির দিতে হবে। তাছাড়া ইংরেজরা পুনা লুটপাট করে অনেক ধনরত্ন বিলাতে পাঠিয়েছেন। যুদ্ধের সময় লুটপাট করে যে টাকা পাওয়া যায় সেটা বিজয়ীর প্রাপ্য। কিন্তু তার পরে যে টাকাপয়সা ধনরত্ন পুনা থেকে লুট করা হয়েছে তা বেআইনি হয়েছে। এই অর্থ ইংরেজের প্রাপ্য নয়। হার্সি প্রস্তাব করলেন যে, প্রথমে ডিরেক্টরদের এই সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হোক। ডিরেক্টররা কর্ণপাত না করলে বোর্ড অব কন্ট্রোলকে ব্যাপারটি জানানো উচিত। ডিরেক্টরদের উপর তাঁদের ক্ষমতা আছে। তাতেও যদি কিছু না হয় তাহলে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের কাছে আবেদন করা ছাড়া উপায় নেই। ইংলণ্ডের রাজা নিশ্চয় এর একটা প্রতিবিধান তাড়াতাড়ি করবেন। ইংলণ্ডের রাজাকে বলা হোক, যেসব ধনরত্ন পুনা থেকে কোম্পানির লোকরা নিয়ে গিয়েছে তার একটি বড় ভাগ তাঁকে দেওয়া হবে। দরকার হলে তার অর্ধেকও দেওয়া হতে পারে। এই লোভ দেখালেই তিনি রাজি না হয়ে পারবেন না।

হার্সি একথা বুঝতে পারেননি যে, ইংলণ্ডের রাজাকে, একটু ঘুরিয়ে হলেও, এটা ঘুষের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলাফল তাঁর পক্ষে ভাল হবে না। হার্সি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর একজন বিচক্ষণ বন্ধু আছেন, তিনি এই চিঠি নিয়ে বিলাতে চলে যাবেন। রামচন্দ্র পন্ত এ প্রস্তাবে রাজি হলেই হার্সি বিঠুরে একজন ব্রাহ্মণ দূত পাঠাবেন। সে ইংরেজি ভাষা ভাল জানে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা যেতে পারে।

খুব আশ্চর্যের কথা, হার্সি কখনও ভাবেননি যে, তিনি আপত্তিকর কথা লিখেছেন। গভর্নর-জেনারেল সব কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, জানতে চাইলেন সত্যিই কি হার্সি এ-রকম কোনো চিঠি লিখেছেন ? হার্সি এর যে জবাব দিলেন তাতে কমিশনার খুশি হলেন না। হার্সি খোলাখুলি তাঁকে বলেছিলেন যে, বাজীরাওয়ের ধনসম্পত্তি যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিয়েছেন সেসব অবৈধ হয়েছে। তিনি নিজেও তো একজন ভুক্তভোগী। লর্ড ওয়েলেসলির সময় কোম্পানি তাঁকে যেসব আশা দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়নি। তিনি নিজে যে বৃত্তি পান তাও খুব কম। কমিশনার যেন এইসব কথা গভর্নর-জেনারেলকে জানান।

গভর্নর-জেনারেল এই সব কথা শুনে খুশি হলেন না। হার্সিকে খুব বকুনি দেওয়া হল। তিনি তো কোম্পানির নিমক খেয়েছেন, কোম্পানির কাছ থেকে পেনসন পান, তাঁর এসব কথা লেখা অন্যায় হয়েছে। আবার যদি এই ধরনের খবর গভর্নর-জেনারেলের কানে আসে তাহলে হার্সির পেনশন তো বন্ধ হবেই, আরও বেশি শাস্তি হতে পারে। হার্সি ধমক খেয়ে চুপ করে রইলেন।

হার্সি আর ভবিষ্যতে বিঠুরের কারুর সঙ্গে পত্রব্যবহার করেননি। তবে কখনও কখনও গুজব শোনা যেত, অন্য কেউ কেউ বাজীরাওয়ের সঙ্গে মিলে অশান্তি করবার চেষ্টা করছে। সেসব বিশ্বাস করবার মতো কথা নয়। একবার সরকারের কাছে খবর গিয়েছিল শিবাজির বংশধর সাতারার রাজা প্রতাপ সিং, যাঁকে ইংরেজরা পেশোয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তিনি বাজীরাও, ব্রহ্মদেশের রাজা ও নেপালিদের সঙ্গে মিলে খুব বড়রকম অশান্তি করবার চেষ্টা করছেন। কেউ বিশ্বাস করেনি একথা। ইংরেজরাও নয়। সাতারার প্রতাপ সিংয়ের রাজত্বের দিন অবশ্য শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প।

ছবি : অনুপ রায়

ধাঁধা

"এবারের ধাঁধা যেন খুব সহজ হয় ছোট্কা।" ধাঁধা নিতে গিয়ে প্রথমেই আমি বললাম, "ইংরেজি নয়, অঙ্ক নয়, শক্ত কোনো কিচ্ছু নয়।"

"কেন, সতুবাবু?" ছোট্কা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "ধাঁধা মানেই তো কিঞ্চিৎ জটিলতা। যা জলের মতো সোজা, তা নিয়ে কখনও ধাঁধা হয়?" একটু থেমে ছোট্কা ফের বলল, "বেশ, তবু আমি চেষ্টা করছি, যাতে শুধু মাথা খাটিয়েই উত্তর বের করা যায়, এমন ধাঁধা দিতে। মুখে-মুখে হলেই ভাল, তাই তো?"

আমি চুপ করে থাকি। আসল কথা হল, পুজোর সময় সব থেকে ভাল পুজোটাই। তখন ধাঁধার মতো জটিল ব্যাপার কার ভাল লাগে?

ছোট্কাও বোধহয় মনে-মনে বুঝে ফেলেছে আমি কেন বলছি কথাটা। কেননা, যে-ধাঁধাগুলো শেষ পর্যন্ত দিল, তা কিন্তু সত্যিই তেমন জটিল কিছু নয়। অথচ মজার। ধাঁধাগুলোই বলি তাহলে।

প্রথম ধাঁধা ॥ আদ্যনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী মণিকা দেবীর সাতটি মেয়ে। প্রত্যেক মেয়ের একটি করে ভাই।

কমপক্ষে কজন হল?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এক বন্ধুকে নিয়ে দু'বার তুমি সিনেমা দেখতে গেলে অথবা দু-বন্ধুকে নিয়ে একবার গেলে সিনেমা দেখতে। ধরো গেলে।

এবার ধরা যাক, তুমিই সবসময় সিনেমার টিকিটের দাম দেবে। তাহলে বলো তো, কোন্ ক্ষেত্রে কম খরচ হবে তোমার? নাকি দুবারই সমান খরচ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ধরো, ডাক্তার তোমাকে তিনটে ওষুধের বড়ি দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আধঘণ্টা পরপর এক-একটা বড়ি খেতে হবে।

বলতে পারো, বড়ি তিনটে খেতে ক-ঘণ্টা সময় লাগবে?

গতবারের উত্তর ॥ (১) LOOK BEFORE YOU LEAP, A STITCH IN TIME SAVES NINE (২) GYPSY,PYGMY, CRYPT, LYMPH (৩) প্রত্যেক শব্দে ইংরেজি বর্ণমালার পরপর তিনটি বর্ণ রয়েছে।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

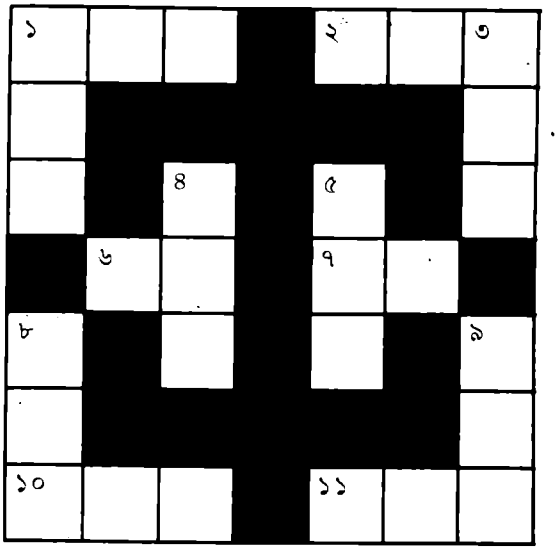

এবারের শব্দসন্ধান জন্তু-জানোয়ার নিয়ে। দু-একটি জন্তুর নাম হবে একটু পোশাকি ধরনের, অর্থাৎ সচরাচর আমরা তাদের যে-নামে ডাকি সে-নাম নয়।

সংকেত: পাশাপাশি: (১) টাকার পর কোন্ জলজন্তুর নাম আসে? (২) কোনো কোনো মানুষের পদবি। (৬) শুয়োর। (৭) খুঁটির জোরে লড়ে। (১০) শূন্যস্থান পূরণ করো: মারি তো — । (১১) চলতে-ফিরতে ঝুমঝুম আওয়াজ তোলে।

উপর-নীচ: (১) গৃহস্থের ভক্ত, চোরের যম। (৩) পশুদের মধ্যে সুন্দর চোখ যার। (৪) ইয়া লম্বা গলা, কিন্তু রা নেই। (৫) মুখে রক্ত ঝরে তবু কাঁটাঝোপ খেতে ভালবাসে। (৮) কোন্ পশু ওলিম্পিকে অংশ নেয়? (৯) দুই পা ছোট দুই পা বড়, লাফ দিতে সে খুবই দড়।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

প	র্জ	ন্য		গো	সা	প
রি			পি			রী
খা	দ		থা		দী	ক্ষা
	র	ক্ত	গো	লা	প	
বা	দা		রা		শ	সা
জ	লা		স		লা	জ
না	ন	ক		স	কা	শ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই শুধু কাগজ-কলম আর বন্ধু। নীচের ছবির মতন একটা খোপ-কাটা ঘর এঁকে বন্ধুর সামনে ধরো—

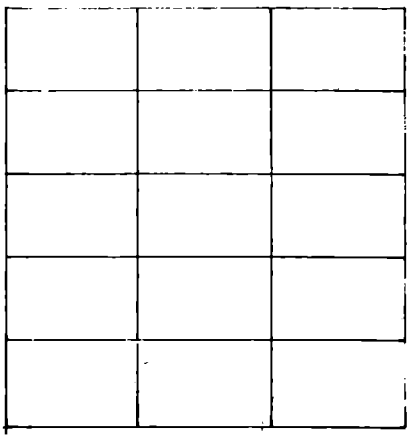

বন্ধু অবাক হয়ে তাকাতেই তাকে বলো, এই খোপের মধ্যে এমনভাবে ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সংখ্যা তাকে বসাতে হবে, যাতে কিনা পাশাপাশি প্রতিটি কলমে যোগফল হয় ২৪, আবার লম্বালম্বিভাবে প্রত্যেক কলমে যোগফল হয় ৪০।

দেখবে, বন্ধু কী দারুণ ঘাবড়ে যায়। একরকমভাবে বললে তবু হত, এ আবার দু-দিকে দু-রকম উত্তর। তবু চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। এক বন্ধু, নাহয় আরেকজন। আর কেউ যদি না পারে, তখন তুমি নিজে।

কী, এবার তুমিই যে ঘাবড়ে গেলে।

কী ভাবছ ? হয় না ? বেশ, তাহলে নীচের সমাধানটা দেখে নাও—

৮	১৫	১	২৪
২	৯	১৩	২৪
১১	৩	১০	২৪
১৪	৬	৪	২৪
৫	৭	১২	২৪
৪০	৪০	৪০	

কী, হল কি না ?

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে ৬টা অ্যাস্‌পিরিন্ খেয়ে ফেলেছে, কী করব ?

উঃ ওর মাথাটা ভাল করে ধরিয়ে দিন।

প্রঃ এক পায়ের সুতো ধরে টানলে এ-পাখি বলবে, হায় ভগবান, অন্য পায়েরটা টানলে বলবে, ও গড, আর দু-পায়েরটা একসঙ্গে টানলে ?

উঃ চিত হয়ে পড়ে যাই, বুদ্ধু !

প্রঃ নতুন লাইসেন্স পেয়েই এত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক হচ্ছে ?

উঃ যতক্ষণ রাস্তায় থাকব ততক্ষণই অ্যাকসিডেন্টের আশঙ্কা, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে চাচ্ছি।

সুসেন

হাসিখুশি

"বইটার উপর তো দেখছি খুব সুন্দর করে লিখে রেখেছ, পরের বই না বলে নিলে চুরি করা হয় ?"

"হ্যাঁ, লিখেছি। তাতে কী হয়েছে ?"

"না, হয়নি কিছুই। ভাবছি এক বছর আগে তোমাকে এই বইটা ধার দেওয়ার সময় আমারই লিখে রাখা উচিত ছিল, সময়মতো পরের বই ফেরত না দিলে জোচ্চুরি করা হয়।"

"চিড়িয়াখানায় গেলে অথচ বলছ ভালুক দেখনি ?"

"সে তো ইচ্ছে করেই দেখিনি। তোমাকেই সামনে পেয়েছিলাম কিনা।"

"সামনের রবিবার আমাদের ক্লাবের রৌপ্যজয়ন্তীতে আসছ নিশ্চয়ই ?"

"তোমার ক্লাবের সদস্যদের যা মেজাজ, ওদিন বরং লৌহজয়ন্তী পালন করলে পারতে।"

"বাঃ বাঃ, ছবিটা তো খুব সুন্দর এঁকেছ। যেমন রঙের ব্যবহার, তেমনি বিষয় নির্বাচন। তোমার হাতের প্রশংসা না করে পারছি না।"

"ওটা ছবি হতে যাবে কেন ? ওটা তো রঙ মোছবার তোয়ালে।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

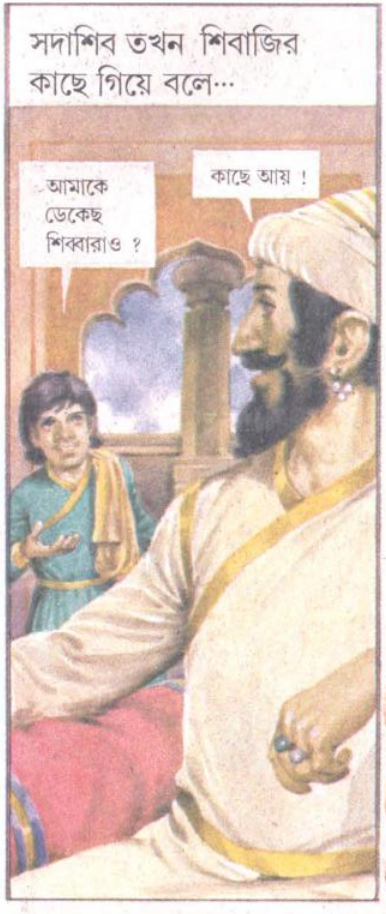

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ঝড় উঠেছে

নদীর ওই শেষমুখেতে
ঝড় উঠেছে ঝেপে-ঝেপে
ও মাঝিভাই—
তোমার ঐ দাঁড়টা টানো
আমি চলে যাই।

সংগীতা ভট্টাচার্য (বয়স ৬)

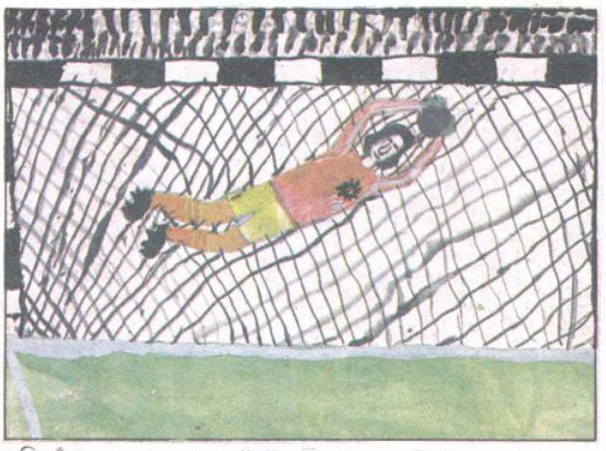

ছবি এঁকেছে **সায়ন মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে **ইন্দ্রনীল চৌধুরী** (বয়স ৭)

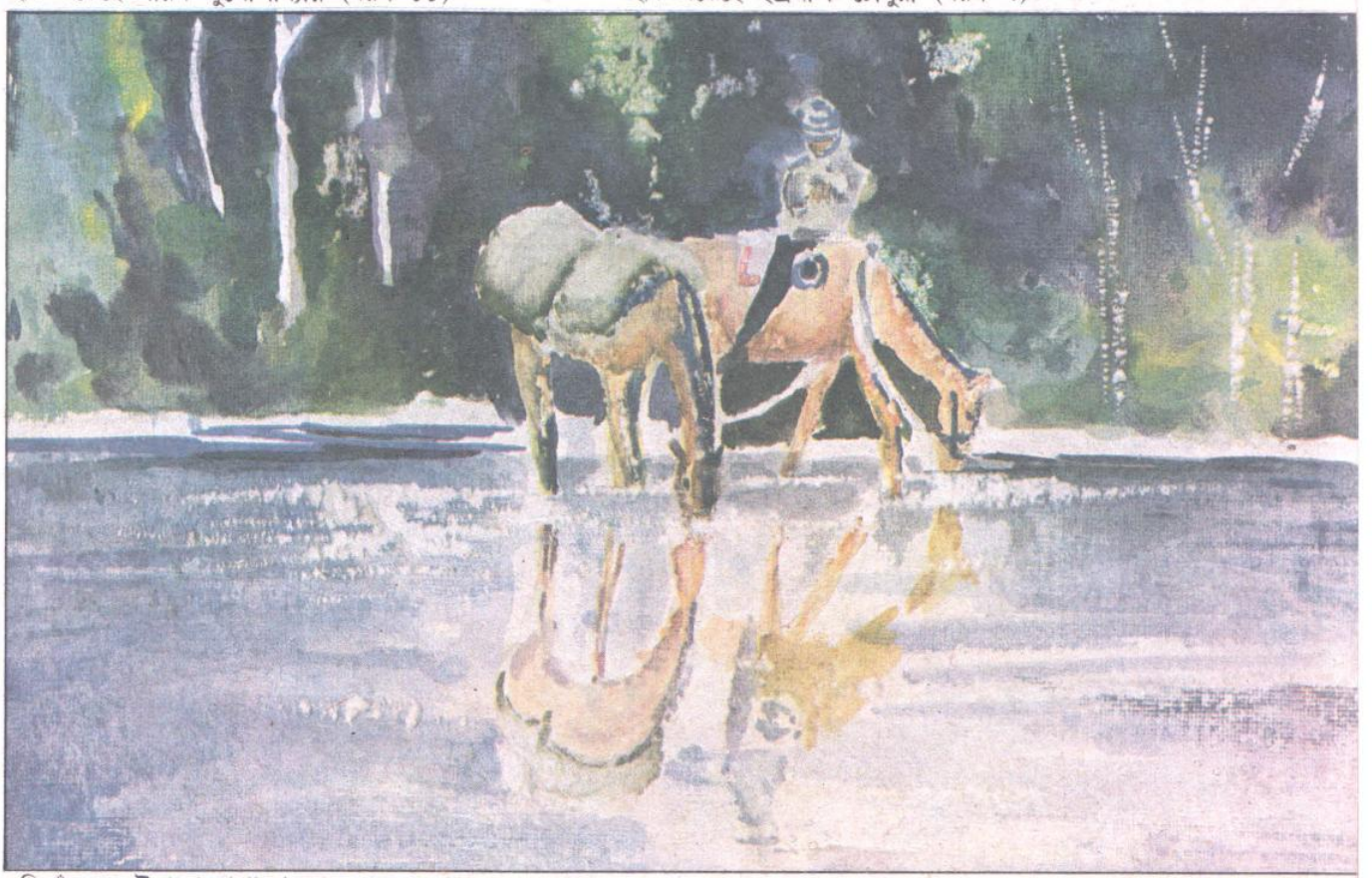

ছবি এঁকেছে **উমা গঙ্গোপাধ্যায়** (বয়স ১৫)

দিদির দাদা হব

মৈনাক আমার ছোট ভাই। ওর সব ব্যাপারই উলটো-উলটো। ও সবসময়ই উলটো-পালটা কাজ করতে চায়। ও ভাবে যে, মাথা নীচের দিকে আর পা দুটো ওপর দিকে করে হাঁটলে কেমন হয়? একবার চেষ্টাও করেছিল, আর এমন আছাড় খেয়েছিল যে, মাথার ব্যথা তিনদিনেও সারেনি।

আমরা তো ভাত চিবিয়ে খাই আর জল খাই গিলে। মৈনাকের কথা হল—আচ্ছা, ভাত যদি গিলে খাই, আর জলটা যদি বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে খাওয়া যেত তাহলে কী মজাই না হত। একবার তাই করতে গিয়ে বিষম-টিষম খেয়ে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার!

সবাই জানে, আমরা ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে বুড়ো হই। কিন্তু মৈনাক ভাবে যে, আমরা যদি বুড়ো হওয়ার পরে ছোট হতাম তাহলে খুব মজা হত। বুড়োরা তো আর খেলতে পারে না। ছোটবেলাটা পরে এলে অনেক লম্বা হত, আর ও মনের সাধ মিটিয়ে খেলত।

মৈনাকের উলটো কাহিনীর আর শেষ নেই। অনেকদিন থেকেই ওর আমার চেয়ে বড় হওয়ার সাধ। একবার আমার জন্মদিনের দিন ও যেন এই ইচ্ছাপূরণের একটা পথ খুঁজে পেল। মাকে বেশ গম্ভীর-গম্ভীর মুখে বলল, "মা, এবার থেকে দিদির জন্মদিন করাটা কিছুদিন বন্ধ রাখো। আর আমারটা চালিয়ে যাও বছর-বছর। তাহলে দিদির বয়স আর বাড়বে না, শুধু আমার বয়সটাই বেড়ে যাবে। এমনি করে আমি বড় হতে হতে একদিন দিদির দাদা হয়ে যাব।"

বাড়ির সবাই ওর কথা শুনে হেসেই খুন। আমার কিন্তু ওকে দাদা ডাকার মোটেই ইচ্ছে নেই।

মঞ্জিমা সাঁই (বয়স ১১)

শীতের আমেজ

শিরশিরিয়ে বাতাস এসে
শিউলিগাছে দোল খাওয়ায়
এখন শীতের আমেজ এসে
মনের মাঝে ঘুম পাড়ায়
ছোট্ট কালো পিঁপড়েটা ওই
পাতায় পাতায় ঘুরছে
ছোট্ট চড়াই একমনেতে
ঘাসে খাবার খুঁজছে
একটুখানি জমির ওপর
সবুজ-সবুজ চারা
নরম রোদে ঝিলমিলিয়ে
মুচকি হাসে তারা

দীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

ছবি এঁকেছে
তন্ময় সামন্ত
(বয়স ১২)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

একবার রামচাঁদের বাউন্সার থেকে কোনোক্রমে মুখ বাঁচাতে গিয়ে হল্ অস্বাভাবিকভাবে ব্যাট তুলে ধরেন, কিন্তু বল ব্যাটে লেগে সীমানা পার হয়ে যায়। চার রান। হল্ প্রথমে ব্যাপারটা হয়তো বুঝতেই পারেননি। মাঠময় লোকের হাততালি শুনে বোধহয় ভেবেছিলেন, তিনি আউট, এবং উইকেট লাভের জন্য রামচাঁদকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সবাই। কিন্তু মুখ ফেরাতেই তিনি দেখলেন, ডিপ ফাইন লেগের ফিল্ডার বাউণ্ডারির বাইরে থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে বোলারের কাছে। তাই দেখে হল্ আহ্লাদে আটখানা। হাততালিটা তাহলে তাঁর উদ্দেশেই। বেশ গর্বিত চালে সতীর্থের দিকে এগিয়ে গেলেন হল্। "কী হে, কেমন বুঝলে ? একেবারে দাগের ওপারে গতি করে দিয়েছি বাউন্সারটার।"

কথা শুনে অ্যাটকিনসন হেসে কুটিপাটি। বলে কী ছোকরা! —"সেটা তোমার কৃতিত্ব মনে কোরো না ওয়েস, প্রভু যিশুর দয়া। খুব জোর বেঁচে গেছে চোয়ালটা।"

পরের বাউন্সারটা প্রায় কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। হল্ সামলে নিয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর ওভার-শেষে এগিয়ে গেলেন রামচাঁদের কাছে। "হেই ম্যান, খুবই ভাল বল করছ তুমি। বেশ হচ্ছে তোমার বাউন্সারগুলো। একটা তো চমৎকার, কান নিয়েই উড়ে যেতে চেয়েছিল। শুধু ভয় দেখানো বা ব্যতিব্যস্ত করা নয়, শুইয়ে দেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট ভাল বোলিং করছ তুমি !"

দেঁতো হাসি হাসলেন রামচাঁদ। সোয়েটার পরতে-পরতে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

কাঁধের ওপর আড়াআড়িভাবে ব্যাট রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে হল্ বললেন, "তবু তো তোমার বলে তেমন জোর নেই। আমার বাউন্সার হজম করে কত লোক যে আমার মৃত্যুকামনা করে !"

রামচাঁদ আম্পায়ারের কাছ থেকে টুপি চেয়ে নিলেন। মাথায় লাগিয়ে উদ্যোগ করলেন ফিল্ডিং করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার। যেতে-যেতে বললেন, "সেটা খুবই সহজবোধ্য ব্যাপার, ওয়েস।"

"হ্যাঁ, তবে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ! একজন নির্ভেজাল ফাস্ট বোলার তার পরম বিশ্বস্ত অস্ত্রটিকে ব্যবহার করবে না, এ তো হয় না। তবে আমার ক্ষেত্রে মনে রেখো, কখনও মানুষ মারার চিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দিই না। আমার কাছে বাউন্সার আমার বোলিংয়ের অঙ্গবিশেষ। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আমি জোরে বল করি না।"

আমি নিশ্চিত, গিলক্রিস্টের মুখ দিয়ে এমন কথা বার হত না কিছুতেই। সে বরং রামচাঁদের বাউন্সারের জবাবে বেশ

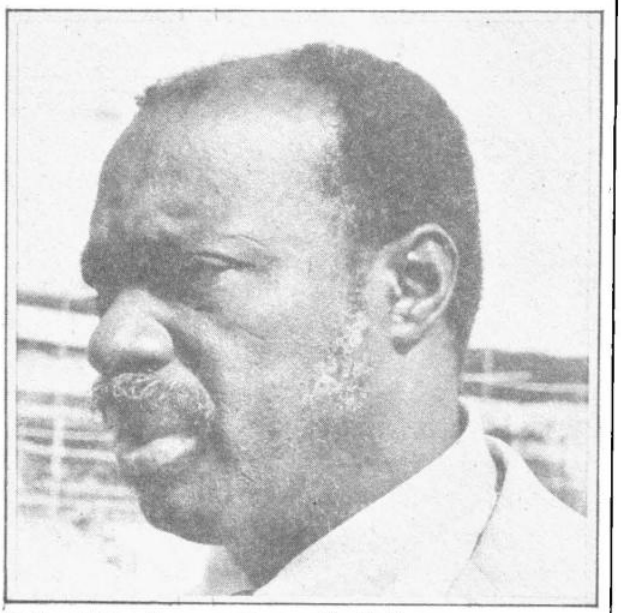

"ফাস্ট বোলার ব্যাট করতে পারলে ক্ষতি কী ?"—হল্

কড়া ধরনের একটা কিছু গালাগাল দেওয়ার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে থাকত এবং দিতও।

ব্যাট করার ব্যাপারেও হলের উৎসাহ ছিল প্রচুর। কেবলমাত্র একজন পেস বোলার এই পরিচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না তিনি। আগ্রহী শিক্ষার্থীর মতো ব্যাটিংয়ে মনঃসংযোগ করতেন। বোলিংয়ে পারদর্শী হলেও ক্রিকেটের অন্যান্য বিভাগগুলিকে তিনি হেলাফেলার বিষয় বলে মনে করতেন না। ১৯৫৮-৫৯ সালে মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে হল্ যথেষ্ট ভাল ব্যাট করেছিলেন।

ইনিংসের শেষে হল্ যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন, তাঁকে দেখে নাক দিয়ে একটা বিদ্রূপাত্মক শব্দ করলেন রয় গিলক্রিস্ট।

অবাক হলেন ওয়েসলি হল্। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন গিলির দিকে। নাক বেঁকিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করলেন গিলক্রিস্ট। "তুমি একজন ফাস্ট বোলার। সেই হিসেবেই দলে তোমার জায়গা। পৃথিবীময় খ্যাতিও তোমার সেই কারণেই। বল মুঠোয় নেওয়া এবং বিপক্ষকে একেবারে চূর্ণ করে দেওয়া, এটাই আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ। ব্যাটসম্যানের কলাকৌশল নিয়ে নাড়াচাড়া করার দরকার কী ? ওসব দেখানোর জন্য দলে অনেক লোক আছে। ব্যাট বগলে করে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারো না, যেমন আমি করি ?"

হলের প্রায় বাক্যরোধ হওয়ার অবস্থা। সতীর্থকে তিনি বেশ ভালমতো চিনতেন। জানতেন যে, এই দুর্বিনীত, বদমেজাজি লোকটির সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সুতরাং কথা বাড়ালেন না হল্। সাজঘরে ধড়াচুড়ো ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, "একজন ফাস্ট বোলার ব্যাট করতে পারলে ক্ষতি কী ? কোনো লোকসান নেই তো।"

(ক্রমশ)

লালচুল সমিতি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মিঃ জাবেজ উইলসন নামে এক ভদ্রলোক শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁর মাথার চুল একদম লাল। তিনি তাঁর সহকারীর পরামর্শে 'লালচুল সমিতি'র আপিসে হাজির হয়ে দেখলেন যে, বেশ কয়েক হাজার লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। তাঁর সহকারীর দক্ষতায় মিঃ উইলসন সেই ভিড় ঠেলে কোনোরকমে আপিসের দরজায় পৌঁছলেন। তারপর···

॥ ২ ॥

জাবেজ উইলসনের প্রতিটি কথাই খুব মন দিয়ে শুনছিল শার্লক হোম্‌স। ভদ্রলোককে এবারে সে বললে, "আপনার অভিজ্ঞতা খুবই অদ্ভুত, বস্তুত এর কোনো তুলনাই হয় না। আমি যত শুনছি, ততই আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। আপনি সব খুলে বলুন। কোন্ তথ্যটা দরকারি আর কোন্‌টা নয়, সে আমি বুঝে নেব। অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনো কিছুই আপনি যেন দয়া করে বাদ দেবেন না।"

"আপিসটা আহামরি কিছু নয়। একটা পাইন কাঠের টেবিল আর গোটাদুয়েক চেয়ার। একটা চেয়ার খালি আর একটায় বসেছিলেন একজন বেঁটে-খাটো লোক। দেখলুম তাঁর চুল বোধহয় আমার চেয়েও লাল। তিনি প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে দু-একটা করে কথা বলছেন আর তাদের একটা-না-একটা খুঁত বের করে বিদায় দিচ্ছেন। যাই হোক, এক সময়ে আমাদের পালা এল।

"ভিনসেন্ট আমাকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি মিঃ জাবেজ উইলসন। ইনি আপনাদের লালচুল সমিতির চাকরির জন্যে আবেদন করতে চান।'

"উত্তরে ভদ্রলোক রললেন, 'বাঃ বাঃ, বেশ বেশ। এঁকে দেখে মনে হচ্ছে এঁর সব রকম যোগ্যতাই আছে।'

"তারপর ভদ্রলোক আমার কাছে সরে এসে দূরে সরে গিয়ে ঘাড় কাত করে নানাভাবে আমার চুলের দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যে, আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করতে লাগল। তারপর তিনি দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এসে আমার দুহাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

"'না। আর বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তার আগে আমাকে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করতে হবে।'

"আমি কিছু বোঝবার আগেই ভদ্রলোক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু হাত দিয়ে আমার চুল ধরে এমন জোরে টানতে লাগলেন যে, যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠলুম।

"'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঠেকে শিখেছি মশাই,' ভদ্রলোক বললেন, 'এর আগে দু-দুবার জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম। একজন এসেছিল চুলে লাল রঙ লাগিয়ে, আরেকজন লাল পরচুলা পরে এসেছিল।'

"'তারপর তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, প্রার্থী মনোনীত হয়ে গেছে। তাঁর কথায় নীচে যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল তারা বেশ কিছুক্ষণ হৈ-চৈ চিৎকার-চেঁচামেচি করে শেষ কালে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

"'আমার নাম ডানকান রস। আমি নিজেও একজন এই সমিতির বেতনভোগী কর্মী। আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত মিঃ উইলসন ? আপনার সংসারে কে-কে আছেন ?'

"আমি অবিবাহিত শুনে মিঃ রসের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'তা হলে তো একটু মুশকিল হল মিঃ উইলসন। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য হল লালচুল লোকের সংখ্যা বাড়ানো। আর তাদের সংসার যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে তাই দেখা। বিপত্নীক হয়ে আপনি তো খুব মুশকিলে ফেলে দিলেন দেখছি।'

"এই কথা শুনে মিঃ হোমস আমি তো খুই দমে গেলুম। মনে হল এ যে শেষকালে তীরে এসে তরী ডুবল। চাকরিটা ফশকে গেল।

"খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ রস বললেন, 'সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। আপনার ঐ অসাধারণ লালচুলের জন্যে কেবলমাত্র আপনার বেলায় আমরা নিয়মটা একটু শিথিল করব। যাক এখন বলুন কবে নাগাদ আপনি কাজ শুরু করবেন ?'

"এবার আমি একটু ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'সামান্য একটা অসুবিধে হচ্ছে ··· মানে আমার নিজের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।'

"'আপনি তার জন্যে মোটেই ভাববেন না। দোকানের দেখাশোনার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' ভিনসেন্ট বলে উঠল।

"'আমাকে কখন আসতে হবে ?'

"'আপনাকে কাজ শুরু করতে হবে সকাল দশটায় আর দুটোর সময়ে ছুটি হবে।'

"এতে মিঃ হোমস আমার খুব সুবিধে হল। আমাদের বন্ধকির কারবার সাধারণত সন্ধের পরেই বেশি হয়। তার মধ্যে আমার বৃহস্পতি-শুক্রবারেই খদ্দেরের ভিড়টা বেশি হয়। কেননা অনেক কলকারখানায় ঐ দুদিন হল মাইনের দিন। তাই সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো অবধি কাজ করতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। আর তাছাড়া যদি কোনো ছুটকো খদ্দের ঐ সময়ে দোকানে এসে পড়ে তো ভিনসেন্টই তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

"'ঐ সময়ে কাজ করতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। তা আপনারা মাইনে কী রকম দেবেন ?'

"'সপ্তাহে চার পাউণ্ড।'

"'কাজটা কী ?'

"'খুবই হালকা।'

"'তবু কাজের ধরনটা জানতে পারলে ভাল হয়।'

"'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে দুটো কথা বলি।

প্রথম কথা হল যে, ঐ সময়টুকু আপনাকে আপিসে হাজির থাকতেই হবে। কোনো অজুহাতে আপিস ছেড়ে বাইরে যাওয়া চলবে না। বাইরে গেলেই আপনার চাকরি খতম।'

"'চার ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকা আমার পক্ষে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।'

"'আরও একটা কথা আছে। চাকরির দ্বিতীয় শর্ত হল কোনো কারণে, সে শারীরিক অসুস্থতা হোক বা অন্য কোনো কাজের জন্যেই হোক, কামাই করা চলবে না। আপনাকে প্রত্যহ আপিসে আসতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে আপিসে বসে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে এজেকিয়া হাপ্‌কিনসের উইলের নির্দেশ খুব পরিষ্কার।'

"'সবই তো শুনলুম। কিন্তু কাজটা কী সেটা তো বলছেন না।'

"'আপনাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করতে হবে। ঐ থাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম খণ্ড রয়েছে। আপনাকে নিজের কাগজ, কালি, কলম আর ব্লটিং পেপার আনতে হবে। ঐ টেবিল-চেয়ারে বসে আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনি কি আগামী কাল থেকে কাজ শুরু করবেন?'

"'হ্যাঁ,' আমি বললুম।

"'খুব ভাল কথা। আমি আশা করি যে, এই কাজ আপনার ভাল লাগবে।' তারপর আমাদের তিনি বিদায় দিলেন। আর আমরাও বাড়ির দিকে পা চালালুম। সেদিন সকাল থেকে পরপর যে-সব কাণ্ড ঘটে গেল তাতে আমার মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎ এই উপরি আয়ের সুযোগ পেয়ে আমার মনে তখন ফুর্তি আর ধরে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মন কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কী করেছি কী বলেছি নিজেই মনে করতে পারছি না।

"তারপর বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় সব কথা বারবার চিন্তা করে আমার মনে হল যে, আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই বোধহয় বিরাট একটা ধাপ্পা। যদিও এই ধাপ্পার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা আমি অনেক ভেবে-চিন্তেও বুঝতে পারলুম না। কেউ যে বিনা কারণে পয়সা খরচা করে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করাবে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। ভিনসেন্টকে আমার সন্দেহের কথা বলাতে ও অবশ্য আমাকে অনেকভাবে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলে। তবুও আমার মনের সন্দেহ গেল না। সে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বাজে ধাপ্পা বলে আমি উড়িয়ে দিলুম।

"পরের দিন ঘুম থেকে উঠতেই গত রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলুম একবার দেখে আসাই ভাল। তাই বেলা দশটার কিছু আগে একটা নতুন কলম, এক বোতল কালি, ব্লটিং পেপার আর ফুলসক্যাপ কাগজ বগলদাবা করে পোপ্‌স কোর্টের দিকে গেলুম।

"সেখানে হাজির হয়ে দেখি আমি মিথ্যে আশঙ্কা করেছিলুম। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। আমি যেতেই মিঃ রস আমাকে আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা চেয়ার-টেবিলটা দেখিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে একেবারে 'A' থেকে লিখতে বললেন। আমিও সময় নষ্ট না করে লিখতে শুরু করে দিলুম। আমি লিখতে আরম্ভ করেছি দেখে মিঃ রস

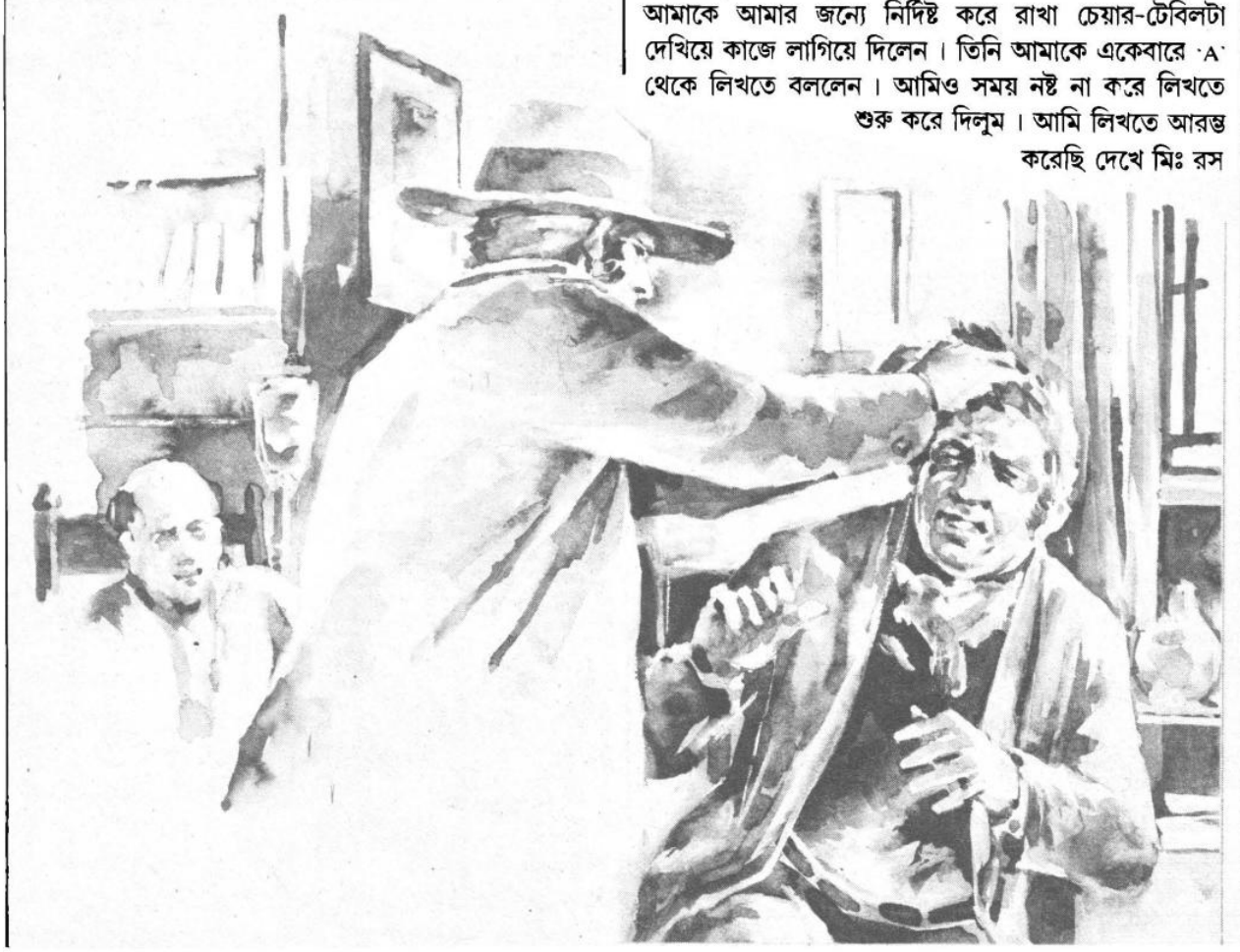

চলে গেলেন। কাঁটায়-কাঁটায় দুটোর সময় মিঃ রস এসে আমার কাজের প্রশংসা করে ও আমাকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দিলেন। বলতে ভুলে গেছি এই দশটা থেকে দুটোর মধ্যে মিঃ রস অবশ্য বারকয়েক আমার কাজের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে এসেছিলেন।

"এই ভাবেই একটা-দুটো করে দিন কাটল। শনিবার দিন ম্যানেজার এসে আমাকে আমার সপ্তাহের মাইনে দিয়ে গেল। তার পরের সপ্তাহেও সাতটা দিন ঠিক একই ভাবে কাটল। একই ভাবে পর-পর বেশ কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমি ঠিক বেলা দশটায় গিয়ে হাজির হতুম, থাকতুম বেলা দুটো অবধি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে মিঃ রস আমার কাজের তদারকি করতে আসা কমিয়ে দিলেন। শেষকালে এমন হল যে, ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হত না। আমি কিন্তু তাই বলে কখনো চেয়ার ছেড়ে উঠতুম না বা কাজে ফাঁকি দিতুম না। এই উপরি টাকাটা পাওয়ায় আমার খুবই সুবিধে হচ্ছিল। তাই আমি মিঃ রসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতুম।

"একই ভাবে আট-আটটা সপ্তাহ অর্থাৎ পুরো দুটি মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমি Abbots, Archery, Armour, Architecture শেষ করে Athica পর্যন্ত নকল করে ফেলেছি। আর কয়েকদিন পরেই 'A' শেষ হয়ে 'B' শুরু হবে। কাগজের জন্যে আমার কিছু খরচ হয়েছে বটে কিন্তু এর মধ্যে আমার লেখায় একটা পুরো শেলফ ভর্তি হয়ে গেছে। একদিন হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"মানে?" শার্লক হোম্‌স ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"মিঃ হোমস, সমিতির আপিস বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই ঘটনাটা ঘটেছে আজ সকালে। যথারীতি সকাল দশটার সময় কাজ করতে গিয়ে দেখি আপিস ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে আর দরজার পাল্লায় পিন দিয়ে একটা পোস্টকার্ডের আকারের কাগজ লাগানো। এই যে সেই কাগজটা।"

ভদ্রলোক কাগজটা আমাদের দেখালেন। কাগজটা সাধারণ ছোট নোটবুকের কাগজের মতো বলে মনে হল। তাতে এই রকম লেখা—

'লালচুলসমিতি বন্ধ হয়ে গেল।
৯ অক্টোবর, ১৮৯০।'

ভদ্রলোকের হাতে-ধরা কাগজটা দেখতে-দেখতে আমাদের নজর একসঙ্গে পড়ল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। আশাভঙ্গ হওয়ায় তাঁর মুখ দেখে শাস্তি পাওয়া লোভী ছেলের কথা মনে হল। আমরা দুজনে একসঙ্গে জোরে হেসে উঠলুম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত ব্যাপারটা একটা কৌতুক বলে মনে হল।

আমাদের অকারণ হাসিতে রেগে গিয়ে মিঃ উইলসন বললেন, "এটাতে এত হাসির কী আছে বুঝতে পারলুম না। আর আমার কথায় যদি হাসি ছাড়া অন্য কিছু বলতে বা করতে আপনারা না পারেন তো বলুন আমি উঠি।"

শার্লক হোম্‌স তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না মিঃ উইলসন, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আপনার এ-ব্যাপারটা তদন্ত করবার ভার আমি নিলুম। তবে একথাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, ব্যাপারটা বেশ মজারও বটে। সে কথা যাক। এখন বলুন ঐ

নোটিসটা দেখে আপনি কী করলেন।"

"আমি তো বুঝলেন একেবারে হতভম্ব। কী করা উচিত তাই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। ঐ বাড়িতে আরো যে-সব আপিস রয়েছে সেখানে খোঁজ করেও কোনো হদিস পেলুম না। অনেক ভেবেচিন্তে মনে হল যে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করলে হয়তো কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। বাড়িওয়ালা একতলায় থাকেন। তাঁর কাছে খোঁজ করাতে তিনি বললেন যে, লালচুল সমিতি বা ঐ ধরনের কোনো কিছুর কথা তাঁর জানা নেই। ডানকান রসের নাম করাতে তিনি বললেন যে, ঐ নামের কাউকে তিনি চেনেন না। তখন আমি বললুম, 'ঐ যিনি চার নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন—'

"'কে ঐ লালচুল ভদ্রলোক ?'

"'হ্যাঁ।'

"'তাই বলুন। তার নাম তো মিঃ উইলিয়ম মরিস। তিনি তো একজন সলিসিটর। তাঁর নিজের অফিসঘর তৈরি হয়নি বলে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমার ঐ ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন। এই তো গতকালই তিনি আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন।'

"'আচ্ছা, কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে বলতে পারেন ?'

"'আপনি তাঁর নতুন আপিসে গিয়ে দেখা করুন। মিঃ মরিস তাঁর নতুন আপিসের ঠিকানা আমার কাছে দিয়ে গেছেন। এই তো তাঁর ঠিকানা ১৭ নং কিং এডোয়ার্ড স্ট্রিট। জায়গাটা সেন্ট পল্‌সের কাছেই।'

"আমি তো মিঃ হোম্‌স, সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেলুম ১৭ নং কিং এডোয়ার্ড স্ট্রিটে। সেখানে গিয়ে কী দেখলুম জানেন ? সেটা একটা ছোট কারখানা। সেখানে কেউই মিঃ রস বা মিঃ মরিস বলে কোনো লোককে চেনে না।"

"তখন আপনি কি করলেন মিঃ উইলসন," হোম্‌স প্রশ্ন করলে।

"তখন আর কী করব। বাড়ি ফিরে এলুম। ভিনসেন্টকে সব কথা বললুম। সেও খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললে যে, হয়তো ডাক মারফত কোনো খবর আসতে পারে। কিন্তু ওর কথা আমি মেনে নিতে পারলুম না। আমার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। ব্যাপারটা কী আমাকে জানতেই হবে। কী করব ভাবতে ভাবতে আমার আপনার কথা মনে পড়ে পড়ল। আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে, আমাদের মতো গরিব লোকদের বিপদে-আপদে আপনি নানাভাবে সাহায্য করেন। তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলুম।"

"খুব ভাল করেছেন। আপনার ব্যাপারটায় আমি বেশ আগ্রহ বোধ করছি। এ 'কেস'টা আমি নিলুম। যতটুকু শুনলুম তাতে মনে হচ্ছে যে, ব্যাপার বেশ গুরুতর।"

"নিশ্চয়ই গুরুতর। আমার সপ্তাহে চার-চার পাউণ্ড আয় কমে গেল বলে কথা।"

অল্প হেসে হোম্‌স বললে, "কিন্তু এই অভিনব সমিতির ওপর আপনার তো রাগের কোনো কারণ নেই। এরা তো আপনার কোনো অনিষ্ট করেনি। উলটে আপনি যে শুধু তিরিশ পাউণ্ড আয় করেছেন তাই নয়, এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে নকল করে নানান বিষয়ে আপনার জ্ঞান কত বেড়েছে বলুন তো ?"

"সে কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তবু কী জানেন, আমাকে জানতেই হবে এরা কে। আর কেনই বা শুধু-শুধু বত্রিশ পাউণ্ড খরচা করে তারা আমার সঙ্গে এ ধরনের রসিকতা—যদি অবশ্য এটাকে রসিকতা বলা যায়—করলে।"

"আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পরে পাবেন। তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আমার প্রথম প্রশ্ন : আপনার ঐ ভিনসেন্ট স্পলডিং, যে আপনাকে ঐ বিজ্ঞাপনটা দেখায়, সে কতদিন আপনার ওখানে কাজ করছে।"

"ও তার প্রায় মাসখানেক আগে থেকে কাজে লেগেছে।"

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ও আপনার চাকরিতে ঢুকল কী করে ?"

"আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম। সেই বিজ্ঞাপন দেখে ও দরখাস্ত করেছিল।"

"বেশ। এবার তিন নম্বর প্রশ্ন। ওই কি একমাত্র দরখাস্ত করেছিল ?"

"না তা কেন হবে। প্রায় জনা-চোদ্দ দরখাস্ত করেছিল।"

"বেশ। আপনি ওকে নিলেন কেন ?"

একটু হেসে মিঃ উইলসন বললেন, "দুটো কারণে। প্রথমত ওকে দেখে বেশ চটপটে আর কাজের লোক বলে মনে হল। আর দ্বিতীয়ত, অন্য সকলের চাইতে ও কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি হল।"

হোম্‌স বললে, "কত কমে ? অর্ধেক মাইনেতে ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা এই ভিনসেন্ট স্পলডিংকে দেখতে কেমন ? তার চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারেন ?"

"দেখতে ? তা বেঁটেই বলা যায়। স্বাস্থ্য ভাল। খুব চটপটে। তবে যাকে বলে মাকুন্দ। কপালে একটা দাগ আছে। একবার এক দুর্ঘটনায় অ্যাসিড পড়ে যায়।"

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে হোম্‌স বললে, "তাই নাকি, তাই নাকি। খুব আশ্চর্য তো। আচ্ছা আপনি কি লক্ষ করেছেন ওর কানে দুল পরবার ফুটো আছে কি না ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। এ-সম্বন্ধে ওকে প্রশ্নও করেছি। ও বললে যে, ছোটবেলায় এক বেদে ওর কানে ফুটো করে দেয়।"

খুব চিন্তিত হয়ে শার্লক হোম্‌স বললে, "হুঁ। আচ্ছা ও কি এখনও আপনার কাজ করছে ?"

"হ্যাঁ। এই তো ওর ওপর দোকানের ভার দিয়ে আমি এখানে এলুম।"

"আচ্ছা, আপনি যখন দোকানে থাকতেন না তখন ও দোকানের দেখাশোনা কী-রকম করত ?"

"খুব ভাল। তবে আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, সকালের দিকে কাজ প্রায় থাকে না বললেই চলে।"

"ঠিক আছে, মিঃ উইলসন। আজ হল শনিবার, দিনদুয়েক বাদে, ধরুন সোমবার নাগাদ আমি আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কিছু বস্তু জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, শতবর্ষ কেটে গেলেও যার বন্ধন অটুট থেকে যায়!

শতবর্ষ আগে হয়েছিল এক পরম্পরার উদয়—
আর ঐ উদয়-সূর্য্যের উজ্জ্বল ছটা, দুনিয়ার দূর-দূরান্তের
দেশে দেশে ছড়াতেই থেকেছিল..... ঘরে ঘরে,
দিদিমা থেকে নাতনী, সবার কাছে।

সেটি ছিল সানলাইট-এর পরম্পরা—বিশুদ্ধতা ও
কোমলতায় ভরা এই পরম্পরা, যার নিত্য পরিবর্তনশীল
এই যুগও না আজ পর্য্যন্ত পেরেছে কোনো পরিবর্তন
আনতে, আর না তা কোনোদিন পারবে। কারণ,বিশুদ্ধতার
ঐ পরম্পরাকে শত শত বর্ষ ধরে কায়েম রাখার জন্যে
যে আমরা শত কঠিন কাজও হাসিমুখে করতে তৈরী রয়েছি।

সানলাইট সাবান ১০০ বছর ধরে চলে আসছে বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা

LINTAS SUN 11 2116 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

ফ্ল্যাশ গর্ডন

জারকভ ও বারিন গুপ্ত-পুলিশের সদর-ঘাঁটিতে এসে হাজির···

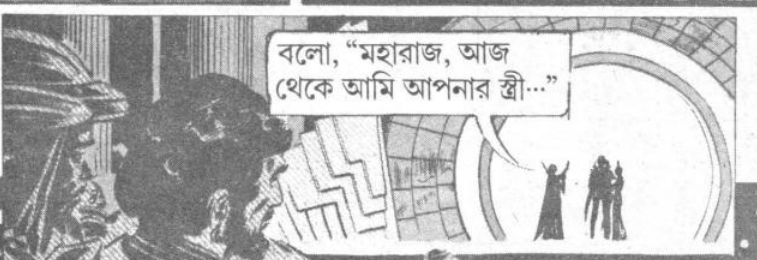

জাল ভেদ করতে ছুটে গেল ফ্ল্যাশের রকেট···

এর পরে আগামী সংখ্যায় ।

মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশো দশ বছর আগে। মেদিনীপুর জেলার এই ঐতিহ্যশালী প্রাচীন স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা মহিষাদলের রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ। মহিষাদল রাজ-পরিবারে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অসীম এবং এই ভাষার ব্যাপক প্রসার দরকার, এটা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। এবং তার ফলেই ১৮৭৪ সালে জেলার এই প্রথম অবৈতনিক হাইস্কুলটির জন্ম হয়। সেই সময় ছাত্র-সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০। প্রখ্যাত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় ও জলধর সেন এই স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। এই স্কুলের বহু কৃতী ছাত্র দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত।

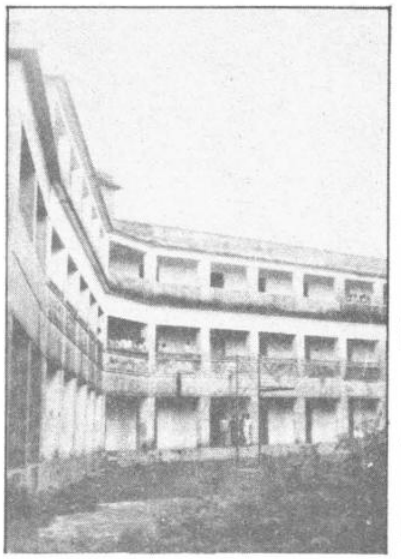

মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ১৩০০। প্রতি বছর ৫০-৬০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। ১০-১২ জন প্রথম বিভাগে পাশ করে। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরই থাকে। এবারে পরীক্ষা দিয়েছিল ৪৫ জন, প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১৪ জন, বাদবাকি দ্বিতীয় বিভাগ। এই স্কুলের ছাত্ররা স্ট্যাণ্ড করেছে অনেকবার।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসনাতন বর্মনের প্রধানশিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ২৭ বছরের। তিনি ইংরেজি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম· এ·। *কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল করা যাবে*, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রমী হতে হবে। স্কুল কামাই করা চলবে না, ক্লাসের পড়া যথেষ্ট মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে। নিয়মিত লেখার অভ্যাস করতে হবে। যাতে বানানভুল না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। প্রশ্নের উত্তর হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। নোটবইয়ের সাহায্য না নিয়ে টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। দ্রুত লেখার অভ্যাস করতে হবে। শুধু একটি দু'টি প্রশ্নের ভাল উত্তর দিলে চলবে না, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমান গুরুত্ব দিয়ে লিখতে হবে।"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবর্মন জানালেন, "ইংরেজিতে পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে বারবার পড়তে হবে। পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নোত্তর, গ্রামার—সবই নিয়মিত লেখার অভ্যাস করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, মাস্টারমশাইদের দেখিয়ে ভুল শুধ্‌রে নিতে হবে। বিদেশী লেখকদের বই এবং ইংরেজি কাগজ নিয়মিত পড়লে ছাত্রছাত্রীরা লাভবান হবে।

"বাংলা মাতৃভাষা বলে এই বিষয়টিকে অনেকেই হেলাফেলা করে, এটা ঠিক নয়। হাতের লেখা অবশ্যই ভাল হতে হবে। ব্যাকরণকে ভয় করলে চলবে না, যত্ন নিয়ে পড়তে হবে। গুরুচণ্ডালী দোষ এবং বানানের ভুল এড়াতে হবে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সহায়ক বই পড়তে হবে। সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা পড়লে শব্দভাণ্ডারই যে শুধু সমৃদ্ধ হবে তা নয়, চিন্তার জগৎও প্রসারিত হবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

"বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই 'অঙ্কাতঙ্কে' ভোগে ! এটা ঠিক নয়। প্রতিদিন অন্তত ২৫টি করে অঙ্ক কষতে হবে, এবং সেই অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। শুধু এক নিয়মে নয়, বিভিন্ন নিয়মে অঙ্ক কষতে হবে। জ্যামিতির ক্ষেত্রে 'এক্সট্রা'কে অবহেলা করলে চলবে না। অঙ্কের যেসব সমাধান-বই বাজারে রয়েছে, সেগুলো যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা ভাল ; এই বইগুলি পড়ুয়াদের বিপথে চালিত করে।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক জানালেন, "পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে খুব মন দিয়ে সহায়ক-বইও পড়তে হবে। চিত্রাঙ্কন নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। রেখাচিত্রের নিয়মিত অনুশীলন পরীক্ষায় ভাল ফল করতে সহায়তা করবে।"

ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "ইতিহাস মোটেই নীরস বিষয় নয়। ইতিহাসে যদি একটু বেশি সময় দেওয়া যায়, ভাল নম্বর ওঠে। ইতিহাসের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব চার্ট রাখা উচিত।

"ভূগোলের প্রথম কথাই হল ম্যাপের ব্যবহার শেখা। ম্যাপ আঁকা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, একটু অনুশীলন করলেই হবে। আবোলতাবোল নয়, উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যানুগ।"

কর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রধান শিক্ষক শ্রীবর্মনের বক্তব্য : "কর্মশিক্ষা বিষয়টি খুব ভাল। এই বিষয়ে ছাত্রদের আগ্রহী করে তুলতে পারলে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বেশি নম্বর উঠবে। ক্লাসের বাইরে বাড়িতেও এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিয়মিত অনুশীলন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনির্ভর হবে এবং তাদের সৌন্দর্যবোধ গড়ে উঠবে।"

'আনন্দমেলা' পত্রিকাটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আমি নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ি, এই কাগজ থেকে আমি যা উপকরণ পাই, তা আমার খুব কাজে লাগে।" প্রধান শিক্ষকের সামনে সহকারী শিক্ষক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ, শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভীম বসে ছিলেন। তাঁরা 'আনন্দমেলা'র লেখাপড়া বিভাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

ফোটো : গোপালচন্দ্র মণ্ডল

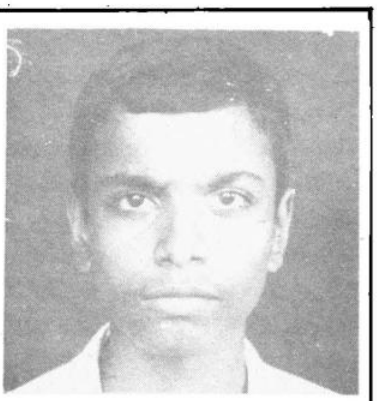

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

মহিষাদল রাজ হাইস্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে দীপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সে গোড়া থেকেই এই স্কুলের ছাত্র। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিল ৬৪০।

দীপক পি· কে· দে-সরকার ও এ· সি· সেনের গ্রামার পড়ে। বাংলা ব্যাকরণে ঋষি দাস ও বিভূতি চৌধুরীর বই। প্রভাতাংশু মাইতি ছাড়াও কিরণ চৌধুরী ও অতুল রায়ের ইতিহাস-বই, এ· মাইতির জ্যামিতি পরিমিতি, জীবনবিজ্ঞানে কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর বই, ভৌতবিজ্ঞানে রঞ্জিত দাস ও বিদ্যুৎকান্তি দাশগুপ্ত এবং সুখেন্দু মাইতির বই, ভূগোলে ভট্টাচার্য-বসুর বই পড়ে দীপক।

পাঠ্যবই ছাড়া দীপক বিদেশী লেখকদের বই পড়তে ভালবাসে। শেক্সপিয়ার এবং ভিক্টর হুগোর প্রায় সব বই-ই তার পড়া।

দীপক ক্রিকেটের পোকা। ক্রিকেট খেলে। গাওসকর তার প্রিয় খেলোয়াড়। ছবি আঁকা আর ফুলের বাগান তৈরির ব্যাপারেও তার অফুরন্ত উৎসাহ। দীপক ভবিষ্যতে একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

'আনন্দমেলা'র কথা উঠতেই দীপকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আনন্দমেলা কে না পড়ে ! লেখাপড়া বিভাগ থেকে খুব সাহায্য পাই। ইতিহাসের গল্প আর খেলাধুলোর লেখাগুলো চমৎকার।" সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তার প্রিয় লেখক।

শ্যামলকান্তি দাশ

ছড়াছড়ি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটা ছিল ছড়া
চারটে ছিল ছড়ি,
মিললে তারা একসঙ্গে
ধুলোয় গড়াগড়ি।

একটা ছিল ঘড়া
তিনটে ছিল ঘড়ি,
বাজলে তারা একসঙ্গে
খুলত খড়খড়ি।

এসব কথা শুনলে পরে
গা পুড়ে যায় দারুণ জ্বরে
ধড়ফড়িয়ে মরি।

চাঁদ নেমেছে

সলিল বেজ

ভূত ভুতুম ভূত,
লক্ষ্মীপেঁচার পুত,
সন্ধেবেলা খোকার চোখে
রাত নামে নিঝুম।
হিম পড়ল টুপ,
খসল পাতা ঝুপ,
মায়ের বুকে চাঁদ নেমেছে
চাঁদের মুখে চুম।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক কোমলতার
নতুন অনুভূতির জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবানের
সমস্ত গুণই ছড়িয়ে পড়বে আপনার
সারা অঙ্গে...আপনার ত্বককে করে
তুলবে মোলায়েম ও কোমল।

নতুন

পণ্ডস্

কোল্ড ক্রীম সাবান

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

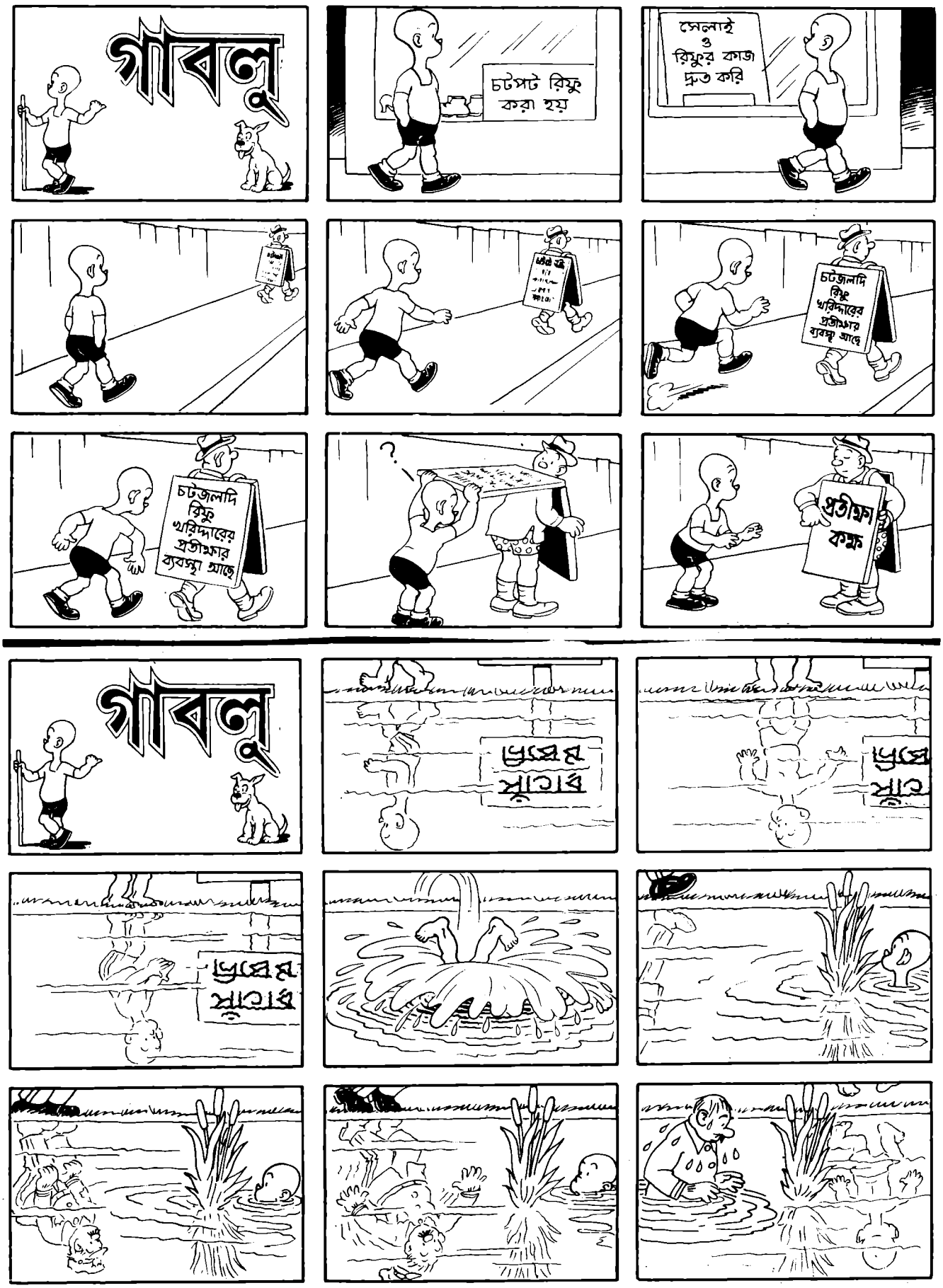
গাবলু
চটপট রিফু করা হয়
সেলাই ও রিফুর কাজ দ্রুত করি
চটজলদি রিফু খরিদ্দারের প্রতীক্ষার ব্যবস্থা আছে
চটজলদি রিফু খরিদ্দারের প্রতীক্ষার ব্যবস্থা আছে
?
প্রতীক্ষা কক্ষ
গাবলু

শিশু শ্রীলঙ্কা দামাল হয়ে উঠছে

অশোক রায়

চট্ করে জিজ্ঞেস করলে বলা শক্ত, ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া লঙ্কা চাষের উপযুক্ত কি না। কিন্তু খোদ লর্ডসের জমিতেই শ্রীলঙ্কা এমন ক্রিকেট খেলল যে, সব ইংরেজের জিভেই এখন লঙ্কাবাটার জ্বলুনি। ১৯৮২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে ইংল্যাণ্ডের কাছে একটি পরাজয় দিয়েই শ্রীলঙ্কার টেস্ট জীবনের শুরু। ইতিমধ্যে ডজনখানেক টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হওয়া সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট-শিশুটি এখনই সাবালকত্ব পেয়ে গেছে, এটা কেউই ভাবেন না। কিন্তু হামাগুড়ির স্টেজ কাটিয়ে উঠেই খোদ লর্ডসে শ্রীলঙ্কা যে খেল্ দেখাল, তাতে গোকুলে যে বড় ক্রিকেট-শক্তি অলক্ষ্যে বেড়ে উঠছে এতে আর কোনো সন্দেহই রইল না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে পরিষ্কার ফাইভ-নিল খাওয়ার পর থেকেই ইংরেজ অধিনায়ককে তাড়া করেছে সমালোচক নামক বোলতার ঝাঁক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলিংয়ের থেকেও ঝাঁঝালো, তীব্র এবং বিদারক আক্রমণে বিব্রত গাওয়ার শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টস্ জিতেই নতুন কিছু একটা করার চেষ্টায় ফিল্ডিং নিলেন। বোলারদের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ দুটি উইকেট দ্রুত জমা পড়ে ইংল্যাণ্ডের সংগ্রহে। কিন্তু তারপর থেকেই ওয়েত্তিমুনি এবং রণতুঙ্গে নামক দুটি সৈনিক শ্রীলঙ্কার ইনিংস পাহারা দেবার কাজে নেমে পড়েন। একদা কলম্বো টেস্টটি হেলাফেলায় জিতে যাওয়ায় ইংরেজরা ভাল করে চিনে নিতে পারেননি সিদাথ ওয়েত্তিমুনি নামের তরুণটিকে। সেই থেকে একটু একটু করে ওপরে উঠে এসেছেন ওয়েত্তিমুনি। শ্রীলঙ্কার পক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি এসেছে তাঁরই ব্যাট থেকে, যিনি ২১৭ রানের রেকর্ড পার্টনারশিপ গড়েছেন রয় ডায়াসের সঙ্গে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ইনিংসের গোড়াপত্তনে এসে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকার অর্থাৎ পরিভাষায় যাকে বলে 'ক্যারিইং দ্য ব্যাটে'র নজির গড়েছেন (বনাম নিউজিল্যাণ্ড) শ্রীলঙ্কার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে। সেই ধাপে-ধাপে উঠে-আসা ওয়েত্তিমুনি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাড়ে-দশঘণ্টাব্যাপী ১৯০ রানের ম্যারাথন ইনিংস খেলে দেখালেন এই মুহূর্তে ওপেনার হিসেবে

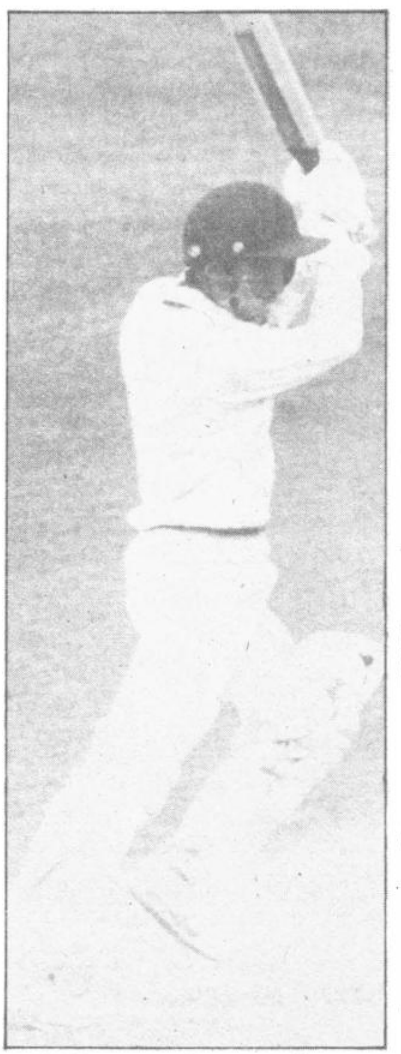

ওয়েত্তিমুনি ম্যারাথন ইনিংস খেললেন

তিনি কতখানি পরিণত। ওয়েত্তিমুনির পাশাপাশি একটি সাহসী সেঞ্চুরি করলেন দিলীপ মেণ্ডিস, অধিনায়কোচিত দৃঢ়তায়। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ারকে সমালোচনার কড়াইতে চাপিয়ে শ্রীলঙ্কা ইনিংস ছাড়ল সাত উইকেটে ৪৯১ রানে। রানের প্লাবনে ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ফৈসলাবাদে গড়া ৪৫৪ রানের রেকর্ডটি ভেসে গেল।

সুতরাং সম্মানের প্রশ্নে ইংল্যাণ্ডের ইনিংসের শুরু থেকেই বেছে নিতে হল 'সতর্কতা' শব্দটিকে। শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড যখন প্রথম ব্যাটিং-অর্ধকে হারিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ২১৮ রানে পৌঁছায় তখনও ফলো-অন বাঁচাতে ৭৪ রানের হুমকি সামনে। উইকেটে স্বীকৃত ব্যাটসম্যান অ্যালান ল্যাম টিমটিম করছেন। অবশেষে ল্যামের পিঠে চেপেই শ্রীলঙ্কার পেস-স্পিনের ঝাপ্টা সামলে ফলো-অনের মরুভূমি পার হয় ইংল্যাণ্ড। ক'দিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ল্যাম্ যে ফর্মের চুড়োয় রয়েছেন সেটা জানিয়ে দিতে লর্ডসেও সেঞ্চুরি সেরে নিলেন তিনি। সময় নষ্ট হওয়ায় এবং ইংল্যাণ্ড ফলো-অন বাঁচানোর ফলে এরপরে খেলাটি শুধু নিয়মরক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে শ্রীলঙ্কার পক্ষে দ্বিতীয় দফায় সেঞ্চুরি করেন অমল সিল্ভা। অধিনায়ক মেণ্ডিস দ্বিতীয় ইনিংসেও অনবদ্য ৯৪ রানের ইনিংস খেলেন। প্রথম ইনিংসেও মেণ্ডিস সেঞ্চুরি করেছিলেন। মাত্র ছ'রানের জন্য লর্ডসে 'জোড়া' সেঞ্চুরির গৌরব পেলেন না। এই মেণ্ডিসকে ভারতীয়রা চট্ করে ভুলবেন না। কারণ ১৯৮২-৮৩ সিরিজে মাদ্রাজে ভারতের বিপক্ষে যে একটিমাত্র টেস্ট শ্রীলঙ্কা খেলেছিল, তাতে মেণ্ডিস দু' ইনিংসেই রান করেছিলেন ১০৫ করে!

এই টেস্ট ড্র হল ঠিকই। কিন্তু দুটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। উইলিস না থাকায় এবং বথাম তাঁর সোনালি দিন পেরিয়ে আসায় বোঝাই যাচ্ছে, ইংলিশ বোলিংয়ে এখন দুধের থেকে জলের ভাগই বেশি। এবং গ্যারি সোবার্সের ট্রেনিংয়ে শ্রীলঙ্কা খুব দ্রুত তার পায়ের নীচে শক্ত মাটি জমিয়ে নিচ্ছে।

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

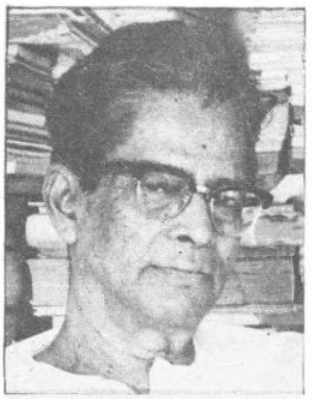

শুধু ঘনাদার গল্প লিখেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর হয়ে থাকতে পারতেন। বল্‌গাহীন কৌতুককল্পনার রাজা এই ঘনাদার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, অনিঃশেষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মজাদার মেসবাড়ি ও তার স্মরণীয় বাসিন্দারা, সন্দেহ নেই, ছোটদের মহলে যেমন বড়দের মহলেও তেমনি, চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এহেন ঘনাদার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যে-তিনটি বই বেরিয়েছে, প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়। আবার এই ঘনাদাকে কোথা থেকে পেলেন তিনি, ঘনাদার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী সংকলনে—'ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস'-এ— যখন শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন মনে না হয়ে যায় না যে, বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য-রোমাঞ্চও কোনো অংশে কম নয়। এ-বই ছাড়াও আরেকটা যে-ছোটদের বই তার নাম হল 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'। উচ্ছল কৌতুকে, হালকা গড়নে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায় যে-সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, তারই নমুনা এই ছড়ার বইতে। সঙ্গে সুধীর মৈত্রের চোখ-জুড়োনো ছবি।

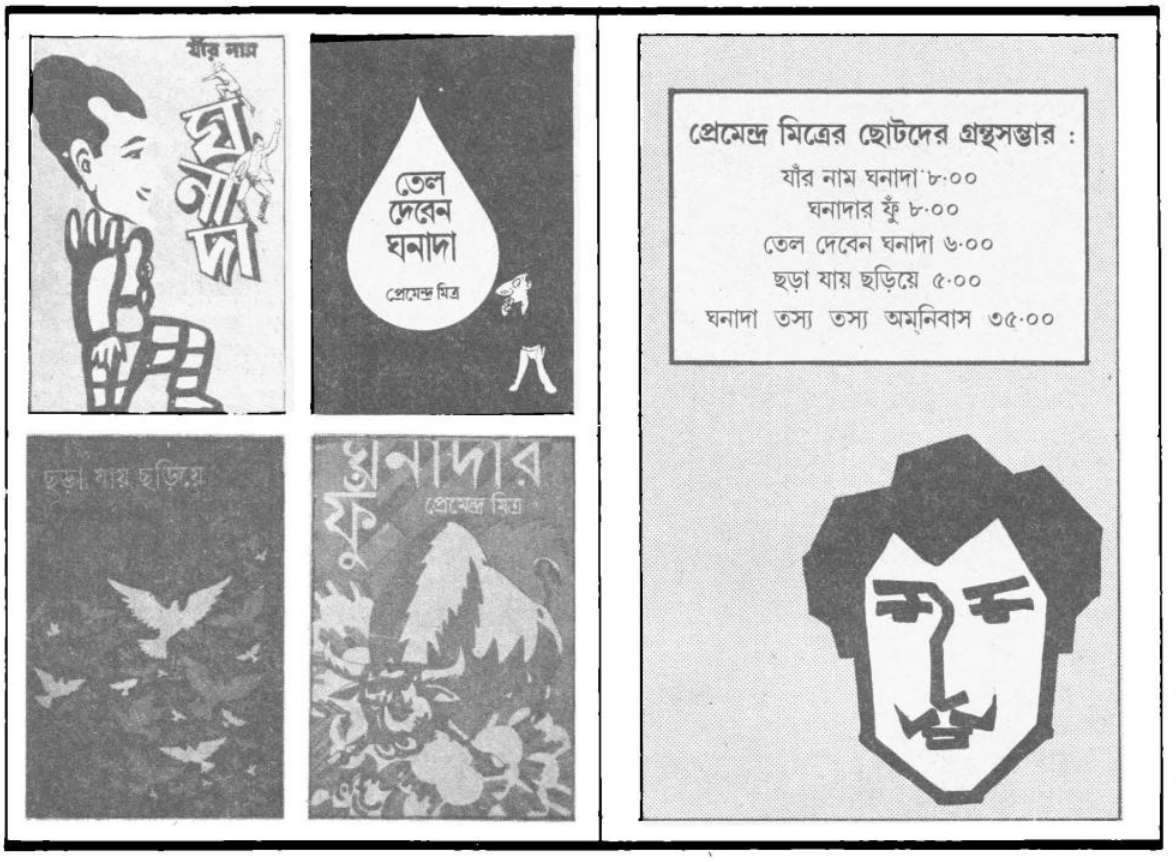

আরো অনেক লেখকের অনেক মন-মাতানো বইয়ের জন্য চলে এসো আনন্দ পাবলিশার্স-এর সেই বইয়ের দোকানে ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ঠিকানায় যে-দোকান কিনা শুধু ছোটদের জন্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গাওয়ারের সামনে আরেক পরীক্ষা

মণীশ মৌলিক

বেচারা ডেভিড গাওয়ার ! অধিনায়ক হবার পর থেকে কী খারাপ সময়ই যে তাঁর পড়েছে, তা কেবল তিনিই জানেন। না, কথাটা ভুল বললাম। শুধু তিনি নন, সমস্ত পৃথিবী জানে। যে-দিনে তিনি অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, সে-দিনটা গাওয়ারের কাছে অনেক আশার পূর্ণতার দিন হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি সারা জীবন ভুলে থাকতে চাইবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এই সিরিজের কথা। কারণ, নেতৃত্বের মুকুট পরেই গাওয়ার যে পরাজয় পেলেন, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই।

আসলে গাওয়ার গোড়াতেই আহত ও ক্ষুধার্ত ব্ল্যাক প্যান্থারের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর থেকে ক্লাইভ লয়েড ও তাঁর দলবল মগ্ন হয়েছেন এক অব্যক্ত প্রতিজ্ঞা পালনে। গোটা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়া যাক, কে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ান। একের পর এক দুর্গ গুঁড়িয়ে দিয়ে যখন তাঁরা ইংল্যাণ্ডে হাজির হলেন, নতুন অধিনায়ক গাওয়ারের অবস্থা ১৯০৭-৮ সালের অধিনায়ক এফ এল ফেনের মতো। দলনায়কের মর্যাদা বরাতে জুটেছে বটে, কিন্তু দলের শক্তি তেমন নয়। অন্যদিকে ঠাসাবারুদ বাহিনী নিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্টি নোবল। ফলাফল : ৪—১ ; বড়ই করুণ। ১৯২০-২১ সালে উইলিয়ম ডগলাস হাতে পেলেন ফেনের চাইতে একটু ভাল দল। তবে আর্মস্ট্রংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে সেটা নস্যি। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো। পাঁচটি টেস্টেই অপমান হজম করতে হল ডগলাসকে। ফিরতি সিরিজেও ইংল্যাণ্ডকে চাবকে দিলেন আর্মস্ট্রং। উইলফ্রেড রোডস লিখেছেন, "আসলে কিছু করবার ছিল না। তুলনায় বড্ড ভাল দল ছিল অস্ট্রেলিয়া। তাই ধোপার পাটে আছড়েছিল ইংল্যাণ্ডকে।"

লয়েডও আছড়ে গেলেন। নির্মম আছড়ানিতে কাতর ইংল্যাণ্ডের গায়ের ব্যথা মরতে যে বেশ কিছুদিন সময় নেবে, তা বোঝা গেল শ্রীলংকার সঙ্গে খেলায়। ইংল্যাণ্ডের বোলিং কোথায় নেমে গেছে, তা বোঝার জন্য শুধু স্কোরকার্ডটুকুই যথেষ্ট। তুলো ধুনে দিয়ে গেছে ওয়েত্তিমুনি, মেণ্ডিজ এবং নবাগত অমল ডি সিলভা। ক্রিকেটের খোদ হেডকোয়ার্টারে সাহেবদের জোর খিমচে দিয়ে গেছে শ্রীলংকা।

ভারতে এসে গাওয়ার সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। ভাবিত নির্বাচকরাও। পাঁচটি টেস্ট, কয়েকটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং অন্যান্য খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে যে কোমরের জোর দরকার, তা ইংল্যাণ্ডের আছে কি ? বলা শক্ত। প্রাক্তন অধিনায়ক উইলিস ঘোষণা করেছেন তাঁর অবসর গ্রহণের কথা। পৃথিবীর সেরা অলরাউণ্ডার ইয়ান বথাম বলেছেন, "উঁহু, আমি যেতে পারব না।" ব্যক্তিগত কাজে আটকে গেছেন তিনি। এই দুটি শূন্যতা ইংল্যাণ্ডকে অনেকখানি দুর্বল করে দেবে। বিশেষত বথামকে এই মুহূর্তে ইংল্যাণ্ডের খুব দরকার। বলে-ব্যাটে এই

ডেভিড গাওয়ার (পরের পরীক্ষা ভারতে)

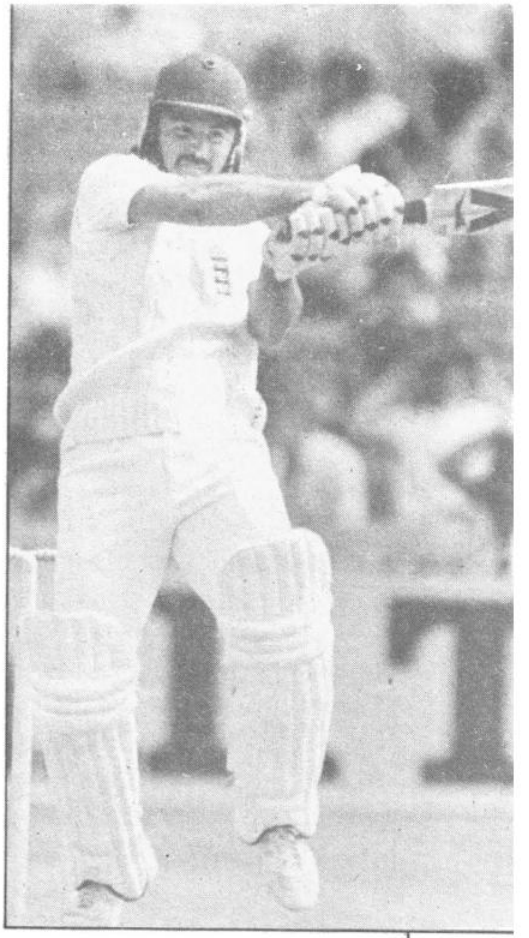

অ্যালান ল্যাম (আসতে পারবেন কি ?)

খেলোয়াড়টির জায়গা পূরণ করবে কে ? কেউ নেই। সত্যিই, গাওয়ারের দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। বাঁ-হাতি গাওয়ারের পরে, এখন ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যাটিং-খুঁটিটির চোখে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অ্যালান ল্যাম সম্পর্কে ডাক্তাররা বলেছেন, অপারেশনের দরকার হতে পারে। চোখে আবছা দেখছেন ল্যাম। অস্ত্রোপচারের দরকার যদি তাড়াতাড়িই হয়ে পড়ে, তবে নিশ্চিতভাবে ল্যামকে ঘরে বসে শুনতে হবে এই সিরিজের খবরাখবর।

তা হলে ? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লর্ডসে যে দল খেলেছে, তার সাতজন নিশ্চিতভাবে ভারতে আসছে। সঙ্গে জোটাতে হবে কিছু প্রতিশ্রুতিমান নতুনকে। তাঁরা কারা ? তোমরা যখন এ লেখা পড়ছ, তখন সে-রহস্য তোমাদের কাছে জল। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষিত হবে খেলোয়াড়দের নাম। আশা করা যাচ্ছে, তাতে অন্তত সাতজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান, ছজন বোলার আর দুজন উইকেটকিপার থাকবেন।

অপ্রতিরোধ্য নাভ্রাতিলোভা ও ম্যাকেনরো

সুব্রত সিংহ

এই মুহূর্তে বিশ্ব টেনিসের আসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক-নায়িকা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বাঁ-হাতি তারকা যথাক্রমে জন ম্যাকেনরো ও মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, তা বলাই বাহুল্য। এই দুজনই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব আর-একবার প্রমাণ করলেন সদ্যসমাপ্ত ইউ· এস· ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা জয় করে।

নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং মেডোজের এই আসরের টেনিস কোর্টে উপস্থিত দর্শকরা দেখলেন একটি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উপভোগ্য টেনিস যুদ্ধ মহিলাদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে। অত্যন্ত উঁচু মানের টেনিস খেলে টেনিসকে সেদিন শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন বর্তমানে বিশ্বের ক্রমপর্যায়ে প্রথম দুই মহিলা টেনিস-তারকা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ও ক্রিস ইভার্ট লয়েড।

প্রথম সেটটি হারিয়েও আদৌ বিচলিত না হয়ে পয়লা নম্বর বাছাই মার্টিনা স্বমূর্তি ধরেন, এবং পরের দুটি সেট জিতে নেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় ইউ· এস· খেতাব। গত বছরও এই ক্রিসকে হারিয়েই তিনি প্রথম এই খেতাব পেয়েছিলেন। এটি মার্টিনার তৃতীয় ফাইনাল ও ক্রিসের নবম।

এ বছর উইম্বলডন টেনিসের ফাইনালেও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এই দুজন। সেখানেও জয় হয়েছিল মার্টিনার। ক্রিস যথাসাধ্য লড়াই করেই তবে হার স্বীকার করেছিলেন। এই আসরে ক্রিস শুধু অসাধারণ সংগ্রামই করেননি। মার্টিনাকে এমন এক-একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন যে, একসময় মনে হয়েছিল তিনি হয়তো মার্টিনার বিজয়রথের চাকা এবারে থামিয়ে দেবেন। উইম্বলডনের তুলনায় তিনি এখানে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম সেটটি জিতে ক্রিস তাঁর সপ্তম খেতাব লাভের আশা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রিসের, মার্টিনা এখন একেবারে সাফল্যের চূড়ায়, হার যে কী জিনিস মার্টিনা সেটা ভুলেই গেছেন। নইলে ১১০টি ম্যাচের ১০৯টি জেতেন ? তাও আবার ৫৫টি ম্যাচে

টানা জয় ?

এই ফাইনাল খেলা নিয়ে মার্টিনা-ক্রিসের সাক্ষাৎ ঘটল ৬১টি ক্ষেত্রে। যার মধ্যে মার্টিনার জয় ৩১টি ক্ষেত্রে ও ক্রিসের ৩০টি ক্ষেত্রে। এর মধ্যে আবার শেষ ১৩টি ম্যাচে ক্রিস একটিবারের জন্যও মার্টিনাকে হারাতে পারেননি।

শুধু সিঙ্গলস জিতেই মার্টিনা ক্ষান্ত থাকেননি। ডাবলসেও তিনি পাম শ্রিভারকে জুড়ি নিয়ে খেলে খেতাব জিতেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইম্বলডনেও এই জুড়ি বিজয়িনী হয়েছিলেন।

নাভ্রাতিলোভার মতো পুরুষদের

সিঙ্গলসেও জন ম্যাকেনরো অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন। যে-কোনো প্রতিপক্ষই তাঁর সামনে পড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছেন। এ বছর ৬৮টি ম্যাচ খেলে ৬৬টিতে জয়ই প্রমাণ করছে যে, তিনি এখন অপ্রতিরোধ্য।

ম্যাকেনরোকে তাঁর চতুর্থ খেতাবটি জিততে খুব একটা ঘাম ঝরাতে হয়নি। মাত্র একশো মিনিটেই তিনি তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী চেকোস্লোভাকিয়ার ইভন লেণ্ডলকে প্রায় ফুৎকারেই উড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ করে দিয়েছেন লেণ্ডলের প্রথম ইউ· এস· খেতাব জয়ের স্বপ্ন।

লেণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই ম্যাকেনরো ছিলেন আক্রমণাত্মক। কোনো সময়েই তিনি তাঁর ওই চেক্ প্রতিপক্ষকে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দেননি। ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের তিক্ত অভিজ্ঞতাই বোধহয় ম্যাকেনরোকে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল। ওই ফরাসি ওপেনের ফাইনালে লেণ্ডলের কাছেই প্রথম দুটি সেট জিতেও শেষ পর্যন্ত ম্যাকেনরোকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

ষষ্ঠ খেতাব লাভের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কোনর্স অসাধারণ লড়াই করেছিলেন তাঁরই সতীর্থ ম্যাকেনরোর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে। শেষ পর্যন্ত ম্যাকেনরোর অপ্রতিরোধ্য গতির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল কোনর্সকে। অবশ্য পাঁচ সেট লড়াইয়ের পর।

অপরদিকে লেণ্ডলকেও এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। পনেরো নম্বর বাছাই অস্ট্রেলিয়ার প্যাট ক্যাশের কাছে তাঁকে প্রায় হারতে বসতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আপন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লেণ্ডল ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন পাঁচ সেট লড়াইয়ের পর।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, উইম্বলডনে যে-চারজন সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেই চারজনই এখানেও সেমিফাইনালে খেললেন।

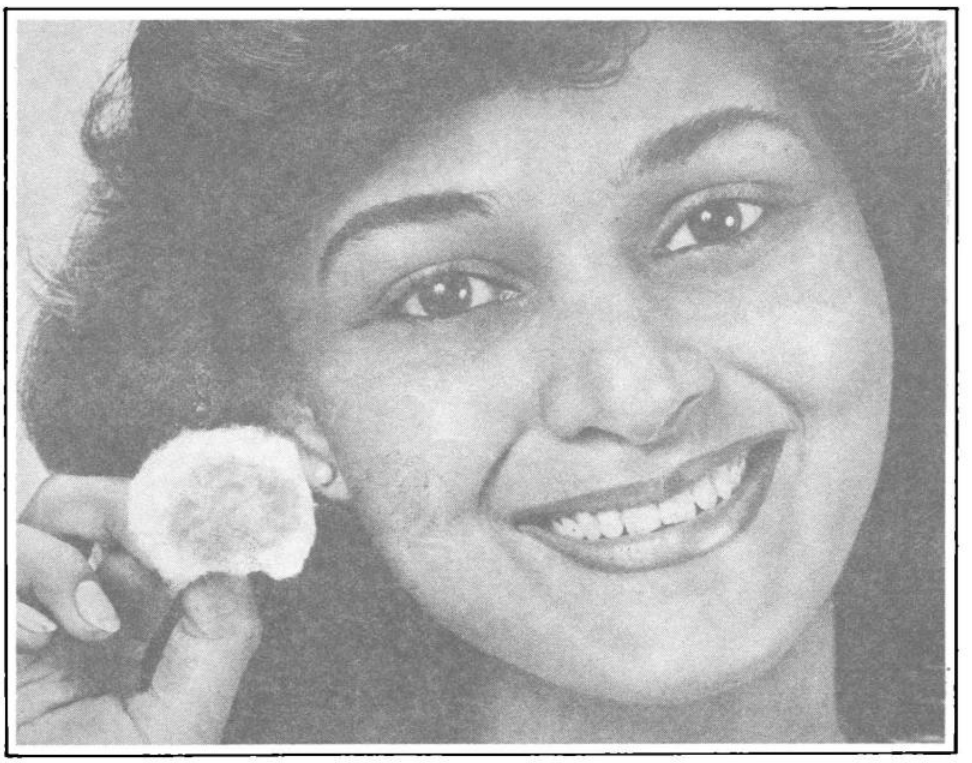

ক্লিয়ারাসিল তুলোর পরীক্ষা করে দেখুন। তেল আর ময়লা দেখছেন তো? এর জন্যই তো ব্রণ হ'তে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার লুকোনো তেলও ময়লা বার করে দিয়ে, মুখমণ্ডলে যে ত্বকের সমস্যার উদ্ভব হয় তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে

তেলতেলে ত্বক ব্রণ হবার মুখ্য কারণ
তেলতেলে ত্বক ধুলোবালি আকর্ষণ করে বলে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্রণ দেখা দেয়। সাধারণ সাবান ও জল শুধু ত্বকের ওপরের ভাগের ময়লাটুকুই পরিষ্কার করতে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার— তেলতেলে ত্বকের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী
ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষমতাযুক্ত এবং এতে আছে বিশেষ ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা। এর তেল দ্রবকারী ক্ষমতা এবং পরিষ্কার করার উপাদানগুলি লোমকূপের মুখ খুলে দেয় এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে।

প্রমাণের জন্য, এই তুলোর পরীক্ষাটি করে দেখুন।
প্রথমে আপনার মুখটি যথারীতি ধুয়ে নিন। এবার কিছু তুলো ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এটি দিয়ে মুখ অর্থাৎ, নাক, কপাল, গাল, থুতনীর আসেপাশে মুছে নিন।

ময়লা দেখতে পেলেন তো? এতেই প্রমাণ হয় সাধারণ সাবান ও জল লুকোনো তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে সফল হয় না, কিন্তু ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার কত সহজে তা করেছে।

রক্ষাপ্রদ ঔষধিক্রিয়া ত্বকের সমস্যার সমাধান করেই চলে।
আপনার ব্যবহারের পরেও ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার ত্বককে রক্ষা করে চলে।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে: দিনে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করুন।

ক্লিয়ারাসিল
মেডিকেটেড ক্লেনজার

OBM-3362-BEN

ANANDAMELA 3 OCTOBER 1984 REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS (C)/731

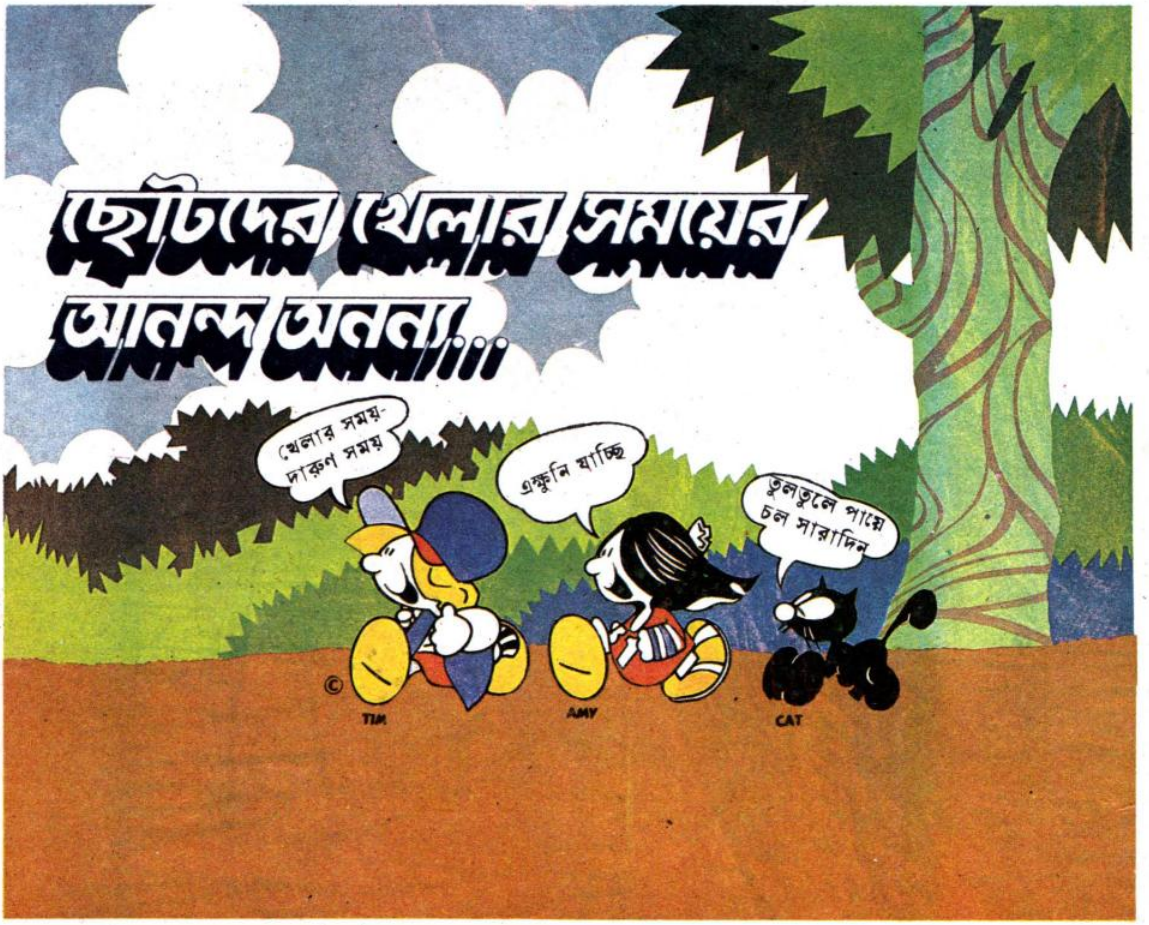

Bubble gummers

বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে
এক মজাদার জুতো

বিশ্বজোড়া নাম। সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের কাছে বাবলগামারস্ জুতো একটি দারুণ আকর্ষণ। নানা রঙে হরেক সাইজে। সোয়েড, চামড়া ও ক্যানভাসে পাওয়া যাচ্ছে জুতো এবং স্যাণ্ডাল। ছোটদের কথা ভেবেই—বাবলগামারস্ তৈরী।

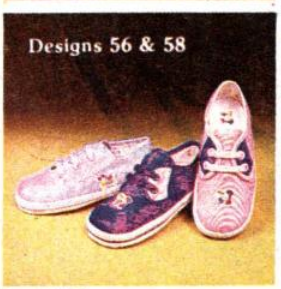

Bata
understands shoes

অগ্রণী BSC-র দোকানেও পাওয়া যায়

React-B-1/84